সপ্তম সংখ্যা] কার্ত্তিক ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সন্ধ্যার যাত্রী

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুঃখের প্রীতি,
বিদায়-বেলায় আজিও রহিল বাকী।

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মত যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মত গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোট—তাহাকে ছোট করিয়াই লিখিব। ছোটকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড় লজ্জা পাইতাম—কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে স্বরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরীব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষ-মাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মা'র হাতেই আমি মানুষ। মা

গরীবের ঘরের মেয়ে, তাই, আমরা যে ধনী একথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে-কোলেই মানুষ—বোধ করি সেইজন্য শেষপর্য্যন্ত আমার পূরাপূরি বয়সই হইল না। আজো আমাকে দেখিলে মনে হইবে আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়-জোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মত তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতামাত্রেই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্য্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে—বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মত করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি—যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়-ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেণ্ট, বিবাহসম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর

করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্ত্তে বাঁধা-হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বেই এম্ এ, পাস করিয়াছি। সাম্‌নে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই, নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই,—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল,—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্ম্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, মেয়ে যদি বল, তবে—। আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মত কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া ধুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত্ত। আমি হরিশকে বলিলাম, একবার মামার কাছে কথাটা পড়িয়া দেখ।

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্ব্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি।

এককালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গল-ঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্য্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরীব গৃহস্থের মতই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে ত কোনো দোষ নাই? না দোষ নাই—বাপ. কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে ত বরের হাট মহার্ঘ্য, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলি সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক্, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্ত-টাকেই মামা আণ্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না। কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা,—আমার পিস্‌তুত ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর

করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে। বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি চমৎকার, সেখানে তিনি বলেন চলনসই। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

(২)

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মত চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুসি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পূরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে সহরের কারো চেয়ে কম নয় সেইটেকেই তিনি নানাপ্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত

নির্জ্জীব,—একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্ তেজ থাকাটা দোষের—অতএব মামা মনে মনে খুসি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণসম্বন্ধে দুইপক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্ত্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক ত স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না—জানিতাম না, দেনা-পাওনা কি স্থির হইল। মনে জানিতাম এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ—এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত আশ্চর্য্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্ব্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্ব্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন এ একেবারে ধরা কথা। এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্যপক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব আমাদের সংসারের এই জেদ, ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধূম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারী করিতে হইলে কেরাণী রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপরপক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাণ্ড, বাঁশী, সখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ

শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্ব্বর কোলাহলের মত্তহস্তি-দ্বারা সঙ্গীত-সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি ত বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুসি হইলেন না। একে ত উঠানটাতে বরযাত্রিদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথ বাবুর ব্যবহারটাও নেহাৎ ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে ত কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্ কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকীল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্‌গদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে সুরু করিয়া বরকর্ত্তাদের প্রত্যেককে বারবার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কি কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, বাবাজি, একবার এই দিকে আস্‌তে হচ্চে।

ব্যাপারখানা এই :—সকলের না হউক কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য

ছিল তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়ি-ভাড়া, সওগাদ, লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যে রকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন দেওয়া-থোওয়াসম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে, এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ সুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন ইহাতে তুমি কি বল?

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, ও আবার কি বলিবে? আমি যা বলিব তাই হইবে।

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

আচ্ছা তবে বোস, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি, —এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, অনুপম এখানে কি করিবে? ও সভায় গিয়া বসুক্।

শম্ভুনাথ বলিলেন, না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা,—হাল ফেসানের সূক্ষ্ম কাজ নয়,—যেমন মোটা, তেমনি ভারী।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, এ আর দেখিব কি? ইহাতে খাদ নাই—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোট্‌বইয়ে গহনাগুলির ফর্দ্দ টুকিয়া লইলেন,—পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, এইটে একবার পরখ করিয়া দেখ।

স্যাকরা কহিল, ইহা বিলাতী মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে

চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন—অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়া বোস গে।

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।

মামা বলিলেন, সে কি কথা? লগ্ন—

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন—সেজন্য কিছু ভাবিবেন না—এখন উঠুন।

লোকটি নেহাৎ ভালোমানুষ-ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন সে কি কথা? বিবাহের পূর্ব্বে বর খাইবে কেমন করিয়া?

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি কি বল? বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?

মূর্ত্তিমতী মাতৃআজ্ঞাস্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে

পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—

মামা বলিলেন,—তা সভায় চলুন, আমরা ত প্রস্তুত আছি।

শম্ভুনাথ বলিলেন, তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?

মামা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?

শম্ভুনাথ কহিলেন—ঠাট্টা ত· আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

মামা দুই চোখ এতবড় করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব একথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ প্রমাণ হইয়া গেছে আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়-লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্ত্তব্যের বরাৎ দিয়া কোথায় যে মহানির্ব্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে ত রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, দেখি, মেয়ের

বিয়ে দেন কেমন করিয়া? কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি?

সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত-বড় সৎপাত্রের কপালে এতবড় কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল,—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান-মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্‌সোশ মিটিত।

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবীতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল তাহা হইলে তামাসার যেটুকু বাকি আছে তাহা পূরা হইবে।

বলা বাহুল্য আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রং একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল সাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কি যে তা

কেমন করিয়া বলিব? আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল।—হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু একমুহূর্ত্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতিসন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মত আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড় আশ্চর্য্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল;—বাহিরে ত সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই কি। না করিবার ত কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুইধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না? হঠাৎ বাহিরে কারো পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা ত লজ্জায় বিবাহ সম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন? হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, মা তোর কি হইয়াছে বল্ আমাকে।—মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, কই, কিছুই ত হয় নি বাবা!—বাপের এক মেয়ে যে,—বড় আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মত মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মত রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, বেশ ত, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক্, আলো জ্বলুক, দেশ বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক্, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।—কিন্তু

যে ধারাটি চোখের জলের মত শুভ্র, সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসিগে।—তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর, আর সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তারপরে আমার কথাটি ফুরালো।

(৪)

কিন্তু কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেল-গাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ ষ্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন :—কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—আর সবই অজানা অস্পষ্ট ;—ষ্টেশনের দীপ কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহুদূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন—

আলোর নীচে সবুজ পর্দ্দা টানা—তোরঙ্গ বাক্স জিনিষপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্ন-লোকের উলটপালট আসবাব, 'সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল —শীগ্‌গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।

মনে হইল যেন গান শুনিলাম। বাঙালী মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কি মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা—শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, এমন ত আর শুনি নাই।

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য। রূপ জিনিষটি বড় কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্ব্বচনীয় আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারি চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম—কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্ম্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল,—আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সাম্‌নে কোনো মূর্ত্তি ছিলনা—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মত, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে

তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ তুমি—চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মত ফুটিয়াছ অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল—আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া —"গাড়িতে জায়গা আছে।" আছে কি, জায়গা আছে কি? জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনেনা। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়? জায়গা আছে, আছে—শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট—মনে আশা ছিল ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি প্ল্যাটফর্ম্মে সাহেবদের আর্দ্দালিদল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্ এক ফৌজের বড় জেনেরালসাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম ফার্ষ্টক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম।

সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না—এখানে জায়গা আছে।

আমি ত চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্য্যমধুর কণ্ঠ, এবং সেই গানেরই ধুয়া—"জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিষপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মত অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্‌তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা ষ্টেশনেই পড়িয়া রহিল—গ্রাহ্যই করিলাম না।

তারপরে—কি লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে তাহাকে কোথায় সুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে,—কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্ম্মল, সৌন্দর্য্যের শুচিতা অপূর্ব্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে

অসম্ভব। এমন কি, সে যে কি রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক—রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মত সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে, সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে ত সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষী কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাৎ কিছুমাত্র ছিল না—ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন্ একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশপঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয় তাহাকেই শোনে, তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্য্যকিরণকে

সজীব করিয়া তুলিল, আমার মনে হইল আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।—পরের ষ্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মত করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসঙ্কোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না? হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না?

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দো-মনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই বিশেষত এমন লোভীর মত খাইতেছে সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারো সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড় ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনেরালসাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই ষ্টেশন্ হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়ীতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা ত ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্ব্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্ম্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া, আমাকে বলিল, এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।

আমি ত তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, না আমরা গাড়ি ছাড়িব না।

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, না ছাড়িয়া উপায় নাই।

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ ষ্টেশন-মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, আমি দুঃখিত কিন্তু—

শুনিয়া আমি কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, না আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা একথা মিথ্যা কথা—বলিয়া নামলেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দ্দালিসমেত ইউনিফর্ম্-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দ্দালিকে প্রথমে ইসারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, ষ্টেশন-মাষ্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি কথা হইল জানি না। দেখা গেল গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও

আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানামুঠ খাইতে সুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত—ষ্টেশনে একটি হিন্দুস্থানী চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি মা ?

মেয়েটি বলিল, আমার নাম কল্যাণী।

শুনিয়া মা এবং আমি দুইজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

তোমার বাবা—

তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি—শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, আমি বিবাহ করিব না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন ?

সে বলিল, মাতৃআজ্ঞা।

কি সর্ব্বনাশ! এ পক্ষেও মাতুল আছে না কি ?

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে," সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়,—আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই—আর মন বলে, এই ত জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই ত আমি জায়গা পাইয়াছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ প্রণাম

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত ! তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে ;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছে প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্ত্তিক ১৩২১
এলাহাবাদ

যৌথ-পরিবার

প্রাচীনেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন, হিন্দুর পরিবার ভাঙ্গায় হিন্দুজাতির অধঃপতন হইতেছে। যদি জাতির পুনরুদ্ধার করিতে হয়, যদি সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সনাতন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কিন্তু সমাজের ঘড়ির কাঁটা উল্টা দিকে ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের যৌথ-পরিবারের পূর্ব্ব পরিসর, বর্ত্তমান যুগের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার পীড়নে বাধ্য হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সহিত পরিবারের অন্তর্নিহিত একীকরণ-শক্তির বিকাশ কতকটা নূতন-রকমের হইতেই হইবে। সুতরাং জাতীয় শক্তিসংযোগের চেষ্টা, ভবিষ্যতে ঠিক অতীতের আদর্শে করিলে চলিবে না।

আমাদের সনাতন পরিবার যে আজ নূতন করিয়া ভাঙ্গিতেছে বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এরূপ মনে করা ভুল। প্রাচীন-সমাজনীতি সম্বন্ধে আমরা প্রাচীন-সাহিত্যে যে. পরিচয় পাই তাহা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, সে সাহিত্য যে যুগযুগান্তের সৃষ্টি সেই-সমুদয় যুগে পরিবারসম্বন্ধে যে, কোন-একটি চিরস্থায়ী সংস্কার বা আদর্শ ছিল এমন নহে। বরং ইহাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, পরিবারের গঠন ও আদর্শ নানা যুগে নানারূপে বিকশিত হইয়াছে; এবং আজ যেমন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার গতিকে পরিবারের মূর্ত্তি ফিরিতেছে, তেমনি অতীত কালেও জাতির

সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবারের গঠন ও আদর্শের নানা প্রভেদ দেশকালভেদে ঘটিয়াছে।

সুদূর অতীতে, বেদের যুগে; সমাজের আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ ছিল এবং তাহা সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত এবং আর্য্যেতর জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে নানা দেশে নানা যুগে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সমুদয় সূত্রগুলি অনুসরণ করিয়া দেখান সাধ্য হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। আমি এ প্রবন্ধে আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে হিন্দুজাতির পরিবার-গঠনসম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের দেশকালভেদে কিরূপ প্রভেদ ঘটিয়াছিল তাহারই কয়েকটি নিদর্শন দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ ব্যক্তি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই বর্ত্তমান অভিশপ্ত যুগেও আমরা নিতান্ত একা থাকি না, আমাদেরও এক-একটা পরিবার আছে। তবে নব্যদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমাদের পরিবারের গণ্ডী ক্রমশঃ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের পরিবার স্বামী স্ত্রী এবং পুত্রকন্যায় পর্য্যবসিত। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়াও আমরা বড় থাকিতে চাই না, দূর-কুটুম্বের তো কথাই নাই।

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পরিবারের আদর্শ অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্য হইতে দেখান যাইতে পারে যে, সেকালে আর্য্যেরা প্রায়ই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হইয়াই থাকিতেন। বৈদিক সাহিত্যে যে-সমুদয় উপাখ্যান আছে তাহাতে বহুকুটুম্বপরিবৃত বিপুল সংসারের বড় অধিক পরিচয় নাই। অধিকাংশ পরিবারই স্বামীস্ত্রী পুত্রকন্যা ও দাসদাসীতে পর্য্যবসিত। ব্রাহ্মণাদিতে এবং প্রয়োগগ্রন্থে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জীবনের

যে ব্যবস্থা দেখিতে পাই তাহাতে এই আদর্শই যেন যথার্থ সনাতন আদর্শ বলিয়া মনে হয়। সেকালে ব্রাহ্মণগৃহে এবং সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-গৃহেও সকলেরই উপনয়ন-সংস্কারের পর গুরু-গৃহবাস অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। সে গুরুগৃহের যে-সকল বর্ণনা আছে তাহাতে অন্তেবাসী যতই অধিক থাকুক, সেখানে বহুগোষ্ঠীর কোনও পরিচয় পাই না। তাহা ছাড়া গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও গুরুকন্যার প্রতি কর্ত্তব্যের যথেষ্ট উপদেশ থাকিলেও তাঁহাদের অধিকতর দূর-কুটুম্বের প্রতি কর্ত্তব্য বা সম্মানাদি প্রদর্শন সম্বন্ধে কোন বিধান পাই না। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্যগণ পত্নী পুত্র ও অনূঢ়া কন্যা লইয়াই সংসার করিতেন, অন্য পরিবার তাঁহাদিগের ছিল না।

তারপর বিধি আছে যে, গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিষ্য গুরুকে বরপ্রদান করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে স্নান করিবে। স্নাতক গৃহে ফিরিয়া দারপরিগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থে এবং অতি আধুনিক গ্রন্থেও আমরা এই বিধান বার বার দেখিতে পাই। এখন এই গৃহপতির অগ্নি-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা কেবলমাত্র স্বতন্ত্র পরিবার-প্রতিষ্ঠার অঙ্গ। এই অগ্নি আজিকার বস্তু নহে। সকল দেশেই আর্য্যগণ গৃহে গৃহে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রীস, রোমপ্রভৃতি সকল দেশেই দেখিতে পাই এই অগ্নি গৃহের দেবতা এবং গৃহের একত্বের লিঙ্গ। এক গৃহে এক অগ্নি ব্যতীত দুই অগ্নি যে থাকিতে পারে না তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নূতন অগ্নি-

প্রতিষ্ঠা নূতন এবং স্বতন্ত্র গৃহ-প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। এইরূপ যখনই নূতন সংসার পাতিবার পরিচয় পাই, তখনই নূতন অগ্নি-প্রতিষ্ঠা তাহার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাই। স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে সংসার ঘুচিয়া যাওয়ার নিদর্শনস্বরূপ অগ্নিতে পত্নীকে দাহ করিয়া পুনরায় নূতন অগ্নি-প্রতিষ্ঠার—অর্থাৎ বিবাহের ব্যবস্থা আছে। যৌথ-পরিবারের বিভাগ হইলে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, নূতন অগ্নি সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র সংসারস্থাপনের পরিচায়ক। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, স্নাতকের বিবাহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ব্যবস্থা যে-যুগের, সে-যুগের সাধারণ ধর্ম্ম ইহাই ছিল যে, লোকে বিবাহ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র গৃহ স্থাপন করিত।

উক্ত শাস্ত্রীয় বিধান-অনুসারে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, পুত্র পুত্র-বধূ পৌত্র পৌত্রবধূ ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি নানা পরিবার লইয়া ভিড় করিয়া একগৃহে থাকাটা সে সময়ে আর্য্যদিগের রীতি ছিল না। ইহা সম্ভবতঃ শূদ্ররীতি; এবং সামাজিক অনুষ্ঠান ও আচারাদির পরিবর্ত্তনের সহিত ঐ শূদ্র বা অনার্য্যরীতি আর্য্য-পরিবারে সংক্রান্ত হয়। কি কারণে ঐরূপ ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, যখন দ্বিজগণ অধিকাংশ আচারভ্রষ্ট হইয়া গুরুগৃহে বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বাস করিতে লাগিল তখন তাহাদিগের সহিত পিতৃপরিবারের বিচ্ছেদ তত সহজ হইত না। হয় তো বা জীবনসংগ্রামের পীড়নে, অন্নবস্ত্রসংগ্রহের অক্ষমতাবশতঃ

অনেকে স্বতন্ত্র গৃহ করিয়া উপবাসী থাকা অপেক্ষা পিতৃগৃহে থাকা শ্রেয়ঃ মনে করিত। ধনী-পিতার পুত্র সহসা পিতার সংসারের ধনদৌলত ফেলিয়া নিজের এক দরিদ্র-সংসার পাতা সুবিধাজনক মনে করিত না। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন আর্য্যজাতির ভিতরে সনাতন ক্ষুদ্র পরিবারের স্থলে ক্রমে বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এ সমুদয় কারণ সম্পূর্ণ আনুমানিক এবং এ সম্বন্ধে যে কোনো প্রমাণ আছে একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

(২)

যাহা হউক, প্রাচীন আর্য্যপরিবারের গঠন-সম্বন্ধে যেমন আমরা একদিকে এই আদর্শ দেখিতে পাই, তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্রে আর-একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শও দেখিতে পাই। তাহা একটি বৃহৎ পরিবার; তাহাতে পিতা-পুত্র-পৌত্র ও প্রপৌত্র একত্রে বাস করে, অবশ্য সপরিবারে। দায়গ্রহণবিষয়ক ত্রৈপুরুষিক সপিণ্ডতা পরিবারের এই আদর্শের পরিচয় দেয়। দায়বিভাগ-সম্বন্ধীয় বিধানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, সেই বিভাগের অংশী কেবলমাত্র ভ্রাতৃগণ নহে, মৃত ভ্রাতার পুত্র, পৌত্র পর্য্যন্ত অংশ পায়। এই প্রথা হইতে ইঙ্গিতজ্ঞ বুঝিবেন যে, যে-কালে এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সে-কালে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত লইয়া এক-সংসার পাতা সম্ভব ছিল। তথাপি এই সমুদয় বিধান আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, এই বৃহৎ পরিবারের সম্মিলনের সূত্র পিতা মাতা; এবং পিতার মৃত্যুর

পর এইরূপ পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং ভ্রাতৃগণের স্বতন্ত্র পরিবার-প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক ছিল। তবে সংসৃষ্টি বা ভ্রাতৃগণের বা পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের একত্র বাস একেবারে ছিল না, এমন বলা যায় না।

এই বৃহৎ পরিবারে যে কেবলমাত্র পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র থাকিত তাহা নহে, অপরাপর ব্যক্তিও থাকিত; তাহারা দায়াধিকারী নহে কিন্তু ভরণাধিকারী। এই ভরণাধিকারীগণ যে পরিবারভুক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা ও পরিচয়সম্বন্ধে স্মৃতিকারদিগের নানা মতভেদ আছে। এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, ভরণাধিকারীসম্বন্ধে এই মতভেদ দেশকালভেদে ভরণাধিকারীর সংখ্যাভেদের পরিচায়ক। সকল দেশে বা সকল কালেই একই কুটুম্ব বা আশ্রিত ব্যক্তি ভর্ত্তব্য ছিল এরূপ নহে; ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশ ও কালের সমাজের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় দিতে গিয়াই যে এরূপ মতভেদে উপনীত হইয়াছেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

এই বৃহৎ পরিবার হিন্দুশাস্ত্রের সনাতন পরিবার নহে। ইহা বৈদিকযুগের পরবর্ত্তীযুগের সৃষ্টি। এই দুইটি স্বতন্ত্র আদর্শের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, উভয় আদর্শের প্রধান প্রভেদ ধন লইয়া। প্রাচীন পরিবার নির্ধন বা অল্পধন; অর্ব্বাচীন যৌথ-পরিবার ধনী। ইহা হইতে এ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ধনের তারতম্যের কারণেই এই আদর্শের তারতম্য; এবং পরবর্ত্তীকালে আর্য্যগণের ধনবৃদ্ধি, আর্য্য-পরিবারে এই পরিসর-

বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। অপরাপর কারণসম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান এত অল্প যে, সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না।

ঔরসপুত্র ছাড়া আর একাদশবিধ পুত্রের পরিচয় আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হই। বৈদিক ও পৌরাণিক দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ নানাবিধ পুত্রের অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণও আমরা পাই। ইহারা পরিবারভুক্ত ছিল কিন্তু সকলযুগেই যে দ্বাদশবিধ পুত্র পরিবার-ভুক্ত ছিল এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। সকল স্মৃতিকার সকলপ্রকার পুত্রের উল্লেখ করেন নাই এবং মনুসংহিতাপ্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতি ব্যতীত অতি প্রাচীন গ্রন্থে আমরা দ্বাদশবিধ পুত্রের পরিচয় পাই না; আবার কোনও কোনও স্থলে পুত্র কাহার হইবে তাহা লইয়া মতভেদও দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্থলে ক্ষেত্রজ পুত্রের কথা বলা যাইতে পারে। মন্বাদির মতে ঐ পুত্র মাতার স্বামীর পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে; স্থলবিশেষে সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা দ্বিপিতৃক হইতে পারে। কিন্তু আপস্তম্বের মতে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মদাতার পুত্র। এই সমুদয় মতভেদ এবং পরি-গণনা-ভেদের তাৎপর্য্য আমি ইহাই বুঝি যে, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকার আপন-আপন কালের সমাজে যে-যে সন্তান যাহার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। এবিষয়ে সমাজভেদে আচারভেদ ছিল। অপরের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন বহু সমাজে প্রচলিত থাকিলেও তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ছিল না। কোথাও বা তাহার উদ্দেশ্য অপুত্র বিধবার পুত্রলাভ, কোথাও বা অপুত্রক পুরুষের পুত্রলাভ; এই উদ্দেশ্যভেদে সমাজব্যবস্থায় পিতৃত্বের প্রভেদ দেখা যায়। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন

সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পুত্র পরিবারের মধ্যে পরিগণিত হইত।

কন্যাগণ পরিবারের মধ্যে সাধারণতঃ পরিগণিত না হইলেও স্থলবিশেষে হইত। পুত্রের ন্যায় পুত্রিকা পিতার পরিবারভুক্ত থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর কন্যাও অবস্থাবিশেষে পিতৃগৃহে বাস করিতেন। পতিকুল নির্ম্মনুষ্য হইলে বিধবা কন্যা পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতেন—শাস্ত্রে ইহার বিধান আছে। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মাদি চারিপ্রকার প্রশস্ত বিবাহ ব্যতীত অপর কোনও উপায়ে কন্যা ভর্ত্তৃযুক্ত হইলে পিতৃকুলে তাহার বাস করা অসম্ভব ছিল না। স্মৃতিচন্দ্রিকার মতে ব্রাহ্মাদি চারিপ্রকার বিবাহেই গোত্রান্তর হয়; গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে গোত্রান্তর হয় না। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে ঠিক যে কোনও স্মৃতি বা শ্রুতির বচন আছে এরূপ বলা যায় না। তথাপি এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ গোত্রান্তর হওয়া একটি অদৃষ্ট ফল, ইহা অদৃষ্টার্থ কার্য্যব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না; শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-বিধির অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রাদিসংযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারাই ইহা সম্পাদিত হয়; এবং ঐ বিবাহবিধি কেবল ব্রাহ্মাদি বিবাহেই প্রযুজ্য, নিন্দিত বিবাহে ঐ বিধির প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং রাক্ষসাদি বিবাহে গোত্রান্তর হইতে পারে না। সুতরাং এই সমুদয় বিবাহে কন্যার পিতৃগোত্রচ্ছেদ হয় না। এই ব্যবস্থার গোড়ার কথা তলাইয়া দেখিলে এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয় যে, এ প্রকার বিবাহে ভর্ত্তৃযুক্ত কন্যা অনেকস্থলে পিতৃকুলেই বাস করিত।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত কন্যার পিতৃগৃহে বাস এবং দৌহিত্রের মাতামহের পরিবারভুক্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া

স্বাভাবিক। এবং এইরূপ কোনও আচারের ফলেই বোধ হয় কন্যা ও দৌহিত্রের দায়াধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কন্যা ও দৌহিত্রের দায়াধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। সামাজিক অবস্থার পীড়নে কন্যা পিতৃকুলে ও দৌহিত্র মাতুলগৃহে কিরূপ অচল হইতে পারে তাহার পরিচয় বঙ্গের কুলীন সমাজে। মেলবন্ধনাদি কারণবশতঃ বিবাহযোগ্য পুরুষের অসদ্ভাবই বঙ্গদেশে এইরূপ পারিবারিক ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাববশতঃ দক্ষিণাপথে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্য প্রকার আচারের সৃষ্টি হইয়াছিল। নম্বুদ্রিগণ যে আর্য্য ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহাদিগের স্বীকৃত অনার্য্য আচার এবং অদ্ভুত পরিবার-গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সামাজিক অবস্থা-হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে দেশভেদে ও কালভেদে পরিবারের আয়তন কখন প্রসারিত কখন সঙ্কুচিত হইয়াছে। সকল দেশে সকল সময়ে একই শ্রেণীর ব্যক্তি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত না। যাহাদিগকে আমরা যৌথ-পরিবারের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করি তাহারা যে সকল সময় পরিবারভুক্ত ছিল এরূপ নহে। এবং পূর্ব্বপক্ষগণ যাহাদিগকে পরিবারভুক্ত বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন না তাহারা পূর্ব্বে কোনও কোনও সমাজে পরিবারভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইত।

(৩)

পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের পরস্পর-সম্বন্ধ আলোচনা করিলে আমরা আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব যে, পরিবারের ব্যক্তিবর্গের

পরস্পরের উপর পরস্পরের অধিকারসম্বন্ধে দেশকালভেদে কত গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে দেখিতে পাই যে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং দাসের উপর গৃহপতির সমান অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব! দান আধান ও বিক্রয় যে পুত্র সম্বন্ধে ঘটিতে পারে তাহার পরিচয় স্মৃতিবাক্যেই পাই। বৈদিক উপাখ্যানে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। নচিকেতা পিতাকর্ত্তৃক বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিলেন; শুনঃশেফকে তাহার পিতা যজ্ঞে বলির জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাণেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদীকে অক্ষক্রীড়ায় পণ রাখিয়া হারিয়াছিলেন; হরিশ্চন্দ্র পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। যজ্ঞাদি বিধানেও এই ধারণা সুস্পষ্ট। মন্ত্র বলিতেছেন, বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে সর্ব্ব"স্ব" দান করিবে, ভার্য্যা ও পুত্র দান করিবে না। ইহা হইতে বুঝা যায় পত্নী ও পুত্র "স্ব" বা সম্পত্তির ভিতর গণ্য হইলেও এই বিশেষ বাক্যের দ্বারা তাহার দান প্রতিষেধ হইয়াছে। অবশ্য শবরস্বামীপ্রভৃতি মীমাংসকেরা এ ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু স্ত্রীপুত্রকে যে দান করা যায় এই ধারণাই যে এই মন্ত্রের মূলে আছে ঐতিহাসিক তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং পিতার, এবং গৌতমাদির বচন-মতে মাতারও যে, পুত্রকে দানাধান বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল এবং স্বামীর যে স্ত্রীকে ঘোড়া গোরুর মত বেচিবার অধিকার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনঃশেফের উপাখ্যান হইতে অনুমান করা যায় যে, পুত্রকে বধ করিবার অধিকারও পিতার ছিল, এবং সে অধিকার ক্রেতা পাইতে পারিত; —শারীরিক দণ্ডাদি সম্বন্ধে তো কোনও কথাই নাই।

ভার্য্যা-পুত্রাদির যেখানে এইরূপ অবস্থা সেখানে তাহাদের যে, গৃহপতির অর্থে কোনও অধিকার ছিল না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অপর পক্ষে পুত্র বা পত্নী যদি কোনও ধন স্বয়ং উপার্জ্জন করিত তাহাও গৃহপতির নিজস্ব হইত। ইহার পরিচয় পরবর্ত্তী স্মৃতিকার-ধৃত অতি-প্রাচীন কয়েকটি বচনে পাই; তাহা হইতে ভার্য্যা পুত্র ও দাস যে সমভাবে গৃহপতির-অধিকৃত বা স্বোপার্জ্জিত ধনে অধিকার-বিহীন তাহা প্রমাণ হয়। পুত্র বা স্ত্রীর ধনাধিকার পরবর্ত্তী স্মৃতিতে ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারগণ, গৃহস্বামী জীবিত থাকিতেও ভিন্ন ভিন্নরূপ ধনে পুত্র ও পত্নীর অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়ন, বৃহস্পতিপ্রভৃতি পরবর্ত্তী স্মৃতিতে এই সমুদয় স্ত্রীধন ও পুত্রের স্বতন্ত্র ধনের পরিগণনা দেখিতে পাই। ইহাদিগের এই অধিকার একদিনে বা একস্থানে স্বীকৃত হয় নাই;—যুগযুগান্তের অবস্থানুরূপ-ব্যবস্থার চেষ্টার ফলে এই অধিকার তাহারা লাভ করিয়াছিল।

কালক্রমে কিরূপ ভাবে একটির পর একটি এই সমুদয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, সামাজিক কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তনের ফলে এই সব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমি এ বিষয়ে বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের মোটামুটি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

শরীরসম্বন্ধে গৃহপতির অধিকার ক্রমশঃ অনেক খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল দেখিতে পাই। পুত্রকে দত্তক-স্বরূপে দান করিবার অধিকার সর্ব্বকালে স্বীকৃত হইলেও তাহাকে বা পত্নীকে সম্পত্তিরূপে গণ্য করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ দান-বিনিয়োগ

মীমাংসক এবং নিবন্ধকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই অভিমতের সপক্ষে স্মৃতি-প্রমাণের অভাব নাই। পুত্রকে বধ করা দূরে থাকুক, তাহাকে যথেচ্ছ শাস্তি দিবার অধিকারও স্মৃতিতে স্বীকৃত হয় নাই। অপরাধ করিলে পুত্র বা শিষ্যকে কিরূপে তাড়ন করিতে হইবে এবং কি প্রকার বেত্রদ্বারা কোথায় আঘাত করিতে পারিবে তাহা স্মৃতিতে উক্ত আছে। তদতিরিক্ত শাস্তি দিবার ক্ষমতা কেবল রাজারই ছিল।

স্বোপার্জ্জিত অর্থে পুত্রের স্বাতন্ত্র্য, স্মৃতিতে ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমে দেখিতে পাই কেবলমাত্র শৌর্য্য, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জিত ধনের স্বত্ব তাহাকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য "পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয়মর্জ্জিতং" বলিয়া এক সাধারণ সূত্রে সকলপ্রকার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই বাক্যের ব্যাখ্যা লইয়া নিবন্ধকারদিগের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে; সে সমস্ত মতভেদ তাঁহাদিগের সমসাময়িক ও স্বদেশস্থ সমাজের ব্যবস্থা-ভেদমূলক। বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের বিধিকে খর্ব্ব করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন এবং পৈতৃক অর্থ বা উপাদানের সামান্যমাত্র সাহায্যে যাহা-কিছু অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা স্বোপার্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এমন কি মৈত্র্য এবং ঔদ্বাহিক সম্পত্তিসম্বন্ধেও তিনি পিতৃদ্রব্যের বিরোধ সম্ভাবনা দেখিয়াছেন। মিতাক্ষরা-কার একদিকে যেমন পুত্রের স্বোপার্জ্জন ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছেন অপর দিকে তাহার পারিবারিক সম্পত্তিতে অতিরিক্ত অধিকার স্বীকার করিয়াছেন।

পিতার সম্পত্তি পরম্পরাগতই হউক, আর স্বোপার্জ্জিতই হউক,

অতি প্রাচীনকালে, তাহাতে যে পুত্রদিগের কোনও স্বত্ব ছিল না তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তার পরবর্ত্তী কালে পারিবারিক সম্পত্তিতে পুত্রাদির অধিকারসম্বন্ধে স্মৃতিগ্রন্থে নানাজাতীয় বাক্য দেখা যায়, সেগুলিকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়, যথা —

প্রথম স্তর—পারিবারিক সম্পত্তিতে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার, কিন্তু দায়-বিভাগে পিতা পুত্রদিগের মধ্যে অসমান বিভাগ করিতে অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয় স্তর—পারিবারিক পরম্পরাগত সম্পত্তির মধ্যে কয়েক প্রকার সম্পত্তিতে পিতা পুত্রদিগের সম্মতি ব্যতীত দানবিক্রয়ের অধিকারী নহেন ; তবে সম্পত্তিতে অধিকার পিতারই।

তৃতীয় স্তর—পরম্পরাগত স্থাবরাদি সম্পত্তিতে পিতার একার স্বামিত্ব নহে, তাহাতে পিতা ও পুত্রের সমান স্বামিত্ব। স্বামিত্ব সমান হইলেই অধিকার সমান হয় না, পরিবার যতদিন পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তির ব্যবহারসম্বন্ধে পিতার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ।

চতুর্থ স্তর—তৃতীয় স্তরের আনুষঙ্গিক ; ইহাতে পুত্রের বিভাগাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোনও বাক্যে বিভাগাধিকার পিতার ইচ্ছায় হইতে পারে বলিয়া উল্লিখিত, কোথাওবা পিতার অনিচ্ছায়ও অবস্থাবিশেষে বিভাগ হইতে পারে, এরূপ স্বীকৃত।

সুতরাং প্রাচীন হিন্দুপরিবারের সম্পত্তিতে পুত্রপৌত্রাদির অধিকার নানাযুগে নানাবিধ ছিল এরূপ অনুমান করা সঙ্গত। একযুগে দেখিতে পাই পুত্রের কোনই অধিকার নাই ; আর এক সময়ে দেখিতে পাই পুত্র পিতার সহিত সমান স্বামী বলিয়া স্বীকৃত

হইয়াছে। বিধিসমূহের এই ভেদ, দেশভেদ ও কালভেদে, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ও আদর্শের ভেদ-অনুসারেই যে হইয়াছিল সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে-কালে সম্পত্তি যৎসামান্য, এবং পুত্র পিতার গৃহে কেবল বিবাহকাল পর্য্যন্ত বাস করিত, সে-কালে, সমাজে সনাতন পৈতৃক-অধিকার অব্যাহত ছিল; এবং যে-কালে পরিবারের ক্রমাগত-সম্পত্তির পরিমাণ অধিক ছিল এবং পুত্রপৌত্রাদি এক-পরিবারভুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল সে-কালে পিতাকর্ত্তৃক পরম্পরাগত সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার সঙ্কুচিত করিয়া পুত্রদিগের ন্যায্য অধিকার নানা-রূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পিতার সহিত পুত্রগণের সমান স্বমিত্ব এবং পিতার অনিচ্ছায় বিকৃতচেতা বা অতিবৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার পুত্রের অধিকার দান, এই চেষ্টার শেষ সীমা।

ব্যবহারশাস্ত্রে আমরা পারিবারিক আদর্শ ও গঠনভেদের যে পরিচয় পাই স্মৃতিসাহিত্যে তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ নিজনিজ সমাজের অবস্থা-অনুসারে শ্রুতিস্মৃতির বিধান ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ব্যবস্থার ভেদ করিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার পুত্রদিগকে পারিবারিক সম্পত্তিতে পিতার সহিত সমান স্বাম্য দান করিয়াছেন এবং কোনও কোনও অবস্থায় পিতার অনিচ্ছায়ও সম্পত্তি-বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপরপক্ষে জীমূতবাহন পিতার সম্পূর্ণ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। এ প্রভেদ সকলের সুপরিচিত। কিন্তু কেবল মিতাক্ষরা দায়-ভাগে যে এই প্রভেদ তাহা নহে। উভয় গ্রন্থেই আমরা

বিশ্বরূপ, ধারেশ্বরাদি বহু পূর্ব্বাচার্য্যের পরিচয় পাই এবং এই প্রভেদ যে পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া গৌণ-নিবন্ধাদিতেও ছোটখাট বিষয়ে পিতাপুত্রের অধিকারসম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী-বিলাস, স্মৃতিচন্দ্রিকা ও ব্যবহারময়ূখ এ বিষয়ে মিতাক্ষরার সহিত সম্পূর্ণ একমত নহে।

(৪)

পরিবারের ভিতর নারীর অধিকারসম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতিতে যে ব্যবস্থার তারতম্য দেখা যায় তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যবস্থায় স্ত্রী অধন, নিরিন্দ্রিয় ও অদায়াদ। অর্থাৎ স্ত্রী কোনও সম্পত্তি স্বয়ং অর্জ্জন করিতে পারে না, এবং কোনও মতে দায় গ্রহণ করিতে পারে না। স্মৃতিসাহিত্যে দেখিতে পাই, ক্রমে স্ত্রীর ধনার্জ্জনের ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে; কয়েকপ্রকার বিশিষ্ট ধনসম্বন্ধে স্ত্রীর অর্জ্জনক্ষমতা স্বীকার করিয়া সেগুলিকে স্ত্রীধন বলা হইয়াছে। স্ত্রীধনের পরিগণনা হইতে দেখিতে পাই যে, রিক্থ, ক্রয়, সংবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ উপায়ে স্ত্রীর কোনওরূপ ধনাধিকার প্রথমে ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে স্ত্রীর দায়াধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; তাহা লইয়াও নানারূপ মতভেদ। পত্নী কন্যা প্রভৃতির দায়াধিকার এবং তাহাদিগের সম্পত্তির উপর তাহাদিগের স্বতন্ত্র অধিকারসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। স্মৃতিকারদিগের পরবর্ত্তী টীকা ও নিবন্ধকারগণ দেশ কাল ও সামাজিক অবস্থাভেদে এ-সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিতাক্ষরাকার

নারীর দানাধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং যে-প্রকারেই নারী সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকুক তাহা স্ত্রীধন হইবে এবং তাহাতে তাহার সমান অধিকার হইবে, বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাকারগণ স্ত্রীলোকের সমুদয় সম্পত্তিতে দানবিক্রয়ের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। জীমূতবাহন স্ত্রীলোকের দায়াধিকার এবং অপরাপর উপায়ে লব্ধ ধনে অধিকার স্বীকার করিয়া বিভিন্ন প্রকার ধনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। কোথাওবা তাহার যথেষ্ট বিনিয়োগের অধিকার আছে, কোথাওবা তাহা নাই। ব্যবহারময়ূখে এবং সংস্কারকৌস্তুভে স্ত্রীগণের অধিকার আরও বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমুদয় গ্রন্থে কেবল যে স্ত্রী দায়াদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা নহে, মিতাক্ষরাকার বিনিয়োগাদিতে পিতা স্বামী প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রক্ষাকর্ত্তাদিগের যে নিষেধাধিকারের ইঙ্গিত করিয়াছেন কমলাকরভট্ট তাহাও প্রায় উড়াইয়া দিয়াছেন। অপর-পক্ষে স্মৃতিচন্দ্রিকায় স্ত্রীলোকের অধিকার অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। স্ত্রীজাতির এই প্রকার অধিকারভেদ বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন যুগে স্ত্রীজাতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই প্রকার অন্যান্য কুটুম্বের দায়াধিকার ও ভরণাধিকারসম্বন্ধে অসংখ্য তারতম্য দেখা যায়। সে সমুদয় তারতম্য দেশকালভেদে পরিবারের গঠন ও আদর্শ-বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। একটি দৃষ্টান্ত দত্তকপুত্র। দত্তকের দায়াধিকার এক্ষণে সকল দেশে সমানভাবে স্বীকৃত। কিন্তু সকল স্মৃতিকারদিগের বচনে ঐক্য নাই। কোনও কোনও স্মৃতিকার দত্তককে মুখ্য দায়াধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাকে অপরাপর জাতীয় পুত্রের পর বসাইয়া-

ছেন, আবার কেহবা তাহাকে অদায়াদ বান্ধবের দলে ফেলিয়াছেন। দত্তকগ্রহণানন্তর পুত্র হইলে দত্তকের স্থান এবং অসিদ্ধ-দত্তকের অধিকারসম্বন্ধেও গোলোযোগ আছে। কোনও কোনও স্থলে দত্তক আংশিক উত্তরাধিকারী, কোথাও বা ভরণাধিকারী, কোথাও বা দাসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এবং অতীত যুগের ব্যবহার-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গৌণপুত্রগণের মধ্যে দত্তকের স্থান পাইতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগতিকে পরিবারের আদর্শ বা গঠনসম্বন্ধে যে সমুদয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র গৌণ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অত্যন্ত মৌলিক বিষয়ে কতকগুলি ব্যবস্থার ভেদ ঘটিয়াছে। কি কি কারণে কোন্ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সামাজিক অবস্থা-ভেদ, ধর্ম্ম ও নীতিগত তারতম্য, অর্থশাস্ত্রীয় সম্পর্কভেদ, অন্যান্য জাতি ও অন্যান্য সমাজের সংঘর্ষ, নরনারী সংখ্যার তারতম্যপ্রভৃতি বিবিধ কারণে দেশকালভেদে হিন্দুপরিবার ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া নানারূপ হইয়াছে। আজ আবার রেল-টেলিগ্রাফের দিনে, সহরের বৃদ্ধির দিনে, নূতন নূতন ধনাগমোপায়ের দিনে, নানাবিধ নৈতিক রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থাভেদে সমাজে পরিবারের এক নূতন মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা পুরাতন হইতে ভিন্ন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সেই পুরাতনও সনাতন নহে বা তদপেক্ষা অধিক পুরাতন পারিবারিক আদর্শ হইতে অভিন্ন নহে। এ পরিবর্ত্তন ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে সে বিচার আমি করিতে চাই না। ইহার যে একটা

মন্দ দিক আছে তাহাও আমি অস্বীকার করিতে চাই না, কিন্তু এ পরিবর্ত্তন যে স্বাভাবিক, এবং হিন্দুসমাজের পক্ষে পরিবর্ত্তন যে একটি অপূর্ব্ব ভয়াবহ পদার্থ নয়, ইহা প্রমাণ করিতে পারিয়া থাকিলেই আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। সামাজিক ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, যুগে যুগে অবস্থাভেদানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াই হিন্দুসমাজ তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

হাসি

এদেশে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার অনুযায়ী দর্শন নাই। এমন কি সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহে আমরা পারদ-দর্শনেরও পরিচয় পাই—অথচ উক্ত জড়-পদার্থের সহিত, কি ঔজ্জ্বল্যে, কি চাঞ্চল্যে, যে ভাব-পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ—সেই হাসির দর্শন আমরা ভারতবর্ষে পাই না।

ভারতমাতার মুখে আজ হাসি নাই—পূর্ব্বে ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

আমাদের এ দেশ দার্শনিক দেশ। এবং চিরকালই জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে হাস্যরস অপেয়, অদেয় এবং অগ্রাহ্য। যে দেশের মাথার উপর বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ-আদি ড্যামোক্লিসের তরবারির ন্যায় অষ্টপ্রহর ঝুলিতেছে—যে দেশের দর্শনপুরাণে বলে ঐহিক সুখের কোনরূপ মূল্য নাই, কারণ সুখ দুঃখানুবিদ্ধ, এবং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ; যে দেশের সামান্য কৃষকেরাও মায়া-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যান করে—সে দেশে হাসির ফুটিয়া উঠিবার অবসর কোথায়? হাসির মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিলে এদেশের লোকে গাম্ভীর্য্যের শিলমোহর-মারা মুখকে জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি মনে করিত না, ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রবীনতায় পক্ককেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিত না, এবং নিরপরাধী বালকবালিকাদিগকে "যত হাসি তত কান্নার" কাল্পনিক বিভীষিকা দেখাইত না। যৌবনসুলভ ক্রীড়াকৌতুককে চপলতার চিহ্ন বলিয়া নিন্দা করা এদেশে বুদ্ধিমান লোকে একটি নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে

গণ্য করেন। ইঁহারা যখন অতি গম্ভীরভাবে বলেন যে "শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশ না"—তখন ইচ্ছা হয় এই উত্তর দিই যে, তোমার বিজ্ঞতার শিং লইয়া তুমি বলিয়া থাক—পরের উদরে সেটি প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টাটা না করিলেই ভাল হয়, কেননা তাহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

এতদ্ব্যতীত আর-একটি কারণে অনেকে হাসির চর্চ্চা করিতে অনিচ্ছুক। ইঁহাদের বিশ্বাস হাসি পদার্থটি বিদেশী—অতএব এই স্বদেশীয়তার দিনে তাহা বয়কট করাতে জাতীয়তার পরিচয় দেওয়া হয়।

হাসি জিনিষটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় না হইলেও এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, অদ্যাবধি পাশ্চাত্য দেশবাসীরাই একাগ্র মনে তাহার চর্চ্চা করিয়াছে। আরিষ্টফেনিসের বক্ত্রে উৎসারিত হাস্যের নির্ঝর উত্তরোত্তর স্ফীত হইয়া বর্ত্তমানে ইউরোপে উত্তালতরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতা হাস্যরসে প্রাণবন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেদিন ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হাসি অন্তর্ধান হইবে—সেদিন ইউরোপীয় সভ্যতাও হিন্দু সভ্যতার ন্যায় ঝুনো হইয়া যাইবে।

ইউরোপে হাসি আছে বলিয়া হাস্যের দর্শনবিজ্ঞানও আছে। দর্শন, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ নির্ণয় করিতে চাহে, তাই দার্শনিক সমাজে নানা মুনির নানা মত—কেননা এ বিশ্বের আদি ও অন্তের সঠিক খবর কেহই জানেন না। অপর পক্ষে বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি, অভিব্যক্তি ও Law-এর কারণ নির্ণয় করিতে চাহে—তাই এ ক্ষেত্রে সকলেই একমত। এই কারণে

হাস্য-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এ বিষয়ে দার্শনিক মতের বিচার করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং অনাবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক মতে হাস্য জীবজগতে ক্রমবিকশিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মনুষ্যেতর প্রাণী ছিলেন। তাঁহারা কোনও আহার্য্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইবামাত্র, ভোজন করিবার পূর্ব্বেই ভোজনক্রিয়ার অভিনয় করিতেন যথা, মুখব্যাদান দন্তবিকাশ ইত্যাদি। তাঁহাদের বংশধরেরা কালক্রমে যখন ইভলিউসানের উন্নত স্তরে আরোহণ করিল—তখন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভোজনানন্দের ভঙ্গীগুলি অন্যান্যরূপ আনন্দের সহিত জড়িত হইয়া গেল। মূল কারণ হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সকল পশুভাবগুলি মানব-সংস্কারে পরিণত হইল। অর্থাৎ যে চাঞ্চল্যের উৎপত্তি উদরে, তাহা হৃদয়ে স্থিতি লাভ করিয়া হাস্যরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল। এককথায় বীভৎসরস হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ এই কারণে অদ্যাবধি অনেকে রসিকতা করিতে হইলে বীভৎস-রসের অবতারণা করেন।

পূর্ব্বোক্ত মত জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মত। সুতরাং ইহা চূড়ান্ত মত নহে। বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্লেষণী বুদ্ধি একেবারে শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। এই কারণে জড়বিজ্ঞান ক্রমে পরমাণু-বিজ্ঞানে পরিণত হয়, এবং জীবতত্ত্ব জীবাণুতত্ত্বে উপস্থিত হয়—Biology Bacteriologyতে পরিণত হয়। যতক্ষণ প্রটোপ্লাজমের মুখে হাসি না দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ হাস্যবিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অণুবীক্ষণের সাহায্যে হাস্যের যে সূক্ষ্মশরীর

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি ও পরিচয় নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

হাসির বীজাণু শুভ্রবর্ণ এবং প্রেম ও ক্রোধের বীজাণু অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র এবং অতিশয় দ্রুতগামী। ইহাদের জন্মভূমি হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হইতে ফুস্‌ফুসে অবতীর্ণ হইয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ইহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হয় এবং আলোকের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে গমন করে। এই জীবাণু অতিশয় সংক্রামক। এই জীবাণু মিথ্যার জীবাণুর জাতশত্রু, এবং শেষোক্ত জীবাণুর সাক্ষাৎ পাইলেই ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করে ও অবলীলাক্রমে পরাভূত করে। এই জীবাণু দধির জীবাণুর ন্যায় স্বাস্থ্যকর, এবং যাহার ধমনীতে ইহারা অবস্থিতি করে তাহার আর বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হয় না। হাস্যের বীজাণু মরিয়া ভূত হইলে তাহা বিষাদের বীজাণুতে পরিণত হয়। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং এই সকল বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা সাধ্যের অতীত। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি যে হাস্য-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তাদের আর যে জ্ঞানই থাকুক না কেন, হাস্যরসের জ্ঞান নাই, নচেৎ তাঁহারা একটি প্রত্যক্ষ কার্য্যের উপর এত অপ্রত্যক্ষ কারণের ভার চাপাইতেন না।

আসল কথা, হাস্য কোনরূপ দর্শন কিম্বা বিজ্ঞানের মধ্যে ধরা পড়ে না। কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা আবিষ্কার কিম্বা উদ্ভাবনা করাই উক্ত উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হাসি কিন্তু স্বভাবতঃই উচ্ছৃঙ্খল। সকল প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই হাসি জন্মগ্রহণ করে, এবং স্বাধীনতাই তাহার লক্ষণ ও ধর্ম্ম। হাসির যদি কোনরূপ বাহ্য কারণ থাকে,

তাহা হইলে কোনও বস্তুর আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ই সেই কারণ। উদাহরণস্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে, যদি কোনও স্থূলকায় ব্যক্তি পিচ্ছিলপথে অগ্রসর হইতে গিয়া সহসা পদদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া সশব্দে ভূপতিত হন, তাহা হইলে অদার্শনিক দর্শকের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ইহার একমাত্র কারণ স্থূলদেহের ঐরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয়ে, তাহার 'যে একটা পরিচিত গাম্ভীর্য্য আছে তাহা একমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হাস্যরসের যে-কোন উদাহরণ দাও না, তাহা এই একই মূলসূত্র অনুসরণ করে। অপর পক্ষে পৃথিবীতে যাহা-কিছু নিজের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, হাসি একমুহূর্ত্তেই তাহাকে ভূতলশায়ী করিতে পারে। চার্ব্বাকের হাসি, যুগসঞ্চিত বিধিনিষেধের স্তূপ, অবলীলাক্রমে ধূলিসাৎ করিয়াছিল। এই কারণেই হাস্যের সহিত দর্শনের চিরদিনই দা-কুমড়ার সম্বন্ধ।

পূর্ব্বোক্ত কারণে হাসিসম্বন্ধে কোনরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা বৃথা। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে—হাস্য করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য।

সনাতন মত যাহাই হউক, মানুষের পক্ষে হাসা যে কর্ত্তব্য তাহার প্রথম কারণ এই যে, জীবজগতে একমাত্র মানুষই এই ক্রিয়ার অধিকারী। পশুপক্ষী ক্রন্দন করিতে পারে, কিন্তু হাসিতে পারে না। সুতরাং হাস্যচর্চ্চা করার অর্থ—মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করা। এ স্থলে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার বিপরীত কার্য্য করা,—সংক্ষেপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃতি দমন করাই মানবের পক্ষে শ্রেয়ঃ অতএব কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে বলা

যাইতে পারে যে, মানুষ যখন কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মিয়াছে তখন তাহার হাসিতে হাসিতে মরাই কর্ত্তব্য।

আর-একটি কারণেও মানুষের হাস্য করা কর্ত্তব্য। জগতে যাহা-কিছু সুন্দর তাহাই হাসে। আকাশে চন্দ্র তারকা হাসিতেছে, সমুদ্র-বক্ষে ফেনপুঞ্জ হাসিতেছে, হাসিতে হাসিতে ফুলের দেহ গাছের উপর হেলিয়া পড়িতেছে, নদীর গালে টোল-খাইতেছে। কালিদাস বলিয়াছেন যে, হিমালয়-শিখরশায়ী তুষাররাশি ত্র্যম্বকের অট্টহাস্য। আধুনিক কবিদিগের মতে কেবল তুষার নয়, সমগ্র সৌরজগৎ সৃষ্টিকর্ত্তার হাসি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবিতে কবিতে যাহা-কিছু মতভেদ তাহা এই লইয়া যে, সে হাসি বিদ্রূপের কি আনন্দের। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় না যে, হাসিতেছে বলিয়াই জ্যোৎস্না, ফুলইত্যাদি সুন্দর। হাসির সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। মানুষ হাসিলে যে তাহাকে সুন্দর দেখায় শুধু তাহাই নহে, তাহার মনের ময়লাও কাটিয়া যায়। সাহিত্য-দর্পণকার বহুপূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, হাসি পদার্থটি শুভ্র, সুতরাং তাহার অন্ধকার বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং নির্ভয়ে অপরকে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে, "যে অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চায় সে থাকুক, কিন্তু তুমি নিজের আলোতে নিজে খেলা কর।" চির-অন্ধকার ত একদিন সকলকেই গ্রাস করিবে--তাই বলিয়া ইতিমধ্যে তুব্‌ড়ির ফুল কেন কাটিবে না?

অতএব যখন স্থির হইল যে, মানুষের পক্ষে দিবারাত্র হাস্য করা কর্ত্তব্য—তখন যে জাতি হাসিতে জানে না, তাহাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং যেহেতু শাস্ত্র ব্যতীত জনসমাজকে শিক্ষা

দিবার অপর-কোনও উপায় নাই, সে কারণ বঙ্গভাষায় হাস্য-শাস্ত্র রচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হাসিসম্বন্ধে কোনরূপ দর্শন বিজ্ঞান রচিত হইতে পারে না—কারণ হাস্য করা একটা আর্ট। এই আর্ট কিরূপে চর্চ্চাদ্বারা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদেরা, অর্থাৎ যাঁহারা শরীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোনও বিশেষ ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলে সেই ভাবও মনের ভিতর জন্মগ্রহণ করে। যদি কেহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তারস্বরে কাহারও উপর কটূকথা বর্ষণ করেন—তাহা হইলে তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইবে; অপর পক্ষে যদি চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া গদ্‌গদস্বরে কাহারও নিকট প্রিয়কথা বলা যায়, তাহা হইলে মনে প্রেমের-বীজ অঙ্কুরিত হইতে বাধ্য। সুতরাং হাস্যোচিত মুখভঙ্গীগুলি কন্ত করিতে পারিলে তোমার মনে হাস্যরসের উৎস খুলিয়া যাইবে। অবশ্য একদিনে এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে না। দিনের পর দিন এই ভঙ্গীগুলি অভ্যাস করিতে হইবে, দস্তুরমত কসরৎ করিতে হইবে। থিয়েটারে কমিক-পার্টের অভিনেতাগণ যেরূপ রিহার্শলের পর রিহার্শল দিয়া মুখের হাসিটি বেমালুম স্বাভাবিক করিয়া তোলেন—তোমাদিগকেও সেই একই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। সংসার-রঙ্গভূমিতে আমরা সকলেই "কমিক একটার"—এই সত্যটি স্মরণ রাখিলে তোমাদের পক্ষে হাস্যের বাহ্য লক্ষণগুলি শিক্ষা করা তত কঠিন হইবে না।

হাসির আর্ট একবার শিক্ষা করিতে পারিলে, সমাজে তাহা অনায়াসে প্রচার করিতে পারিবে। তুমি ভালবাসিলে যে অপরকে ভালবাসাইতে পারিবে, এমন কোনও কথা নাই—কিন্তু তুমি হাসিতে পারিলে অপরকে হাসাইতে পারিবে ; কেননা হাসি সংক্রামক—প্রেম নয়।

শিক্ষার্থীদিগের সাহায্যার্থে হাসির বাহ্য লক্ষণগুলি নির্ণয় করা আবশ্যক। হাসি নানাজাতীয়, এবং বিভিন্ন জাতির হাস্যের আবির্ভাবের স্থানও স্বতন্ত্র। সুতরাং আমি উপসংহারে সংক্ষেপে হাসির জাতিভেদের পরিচয় নিম্নে অঙ্কিত করিয়া দিতেছি।

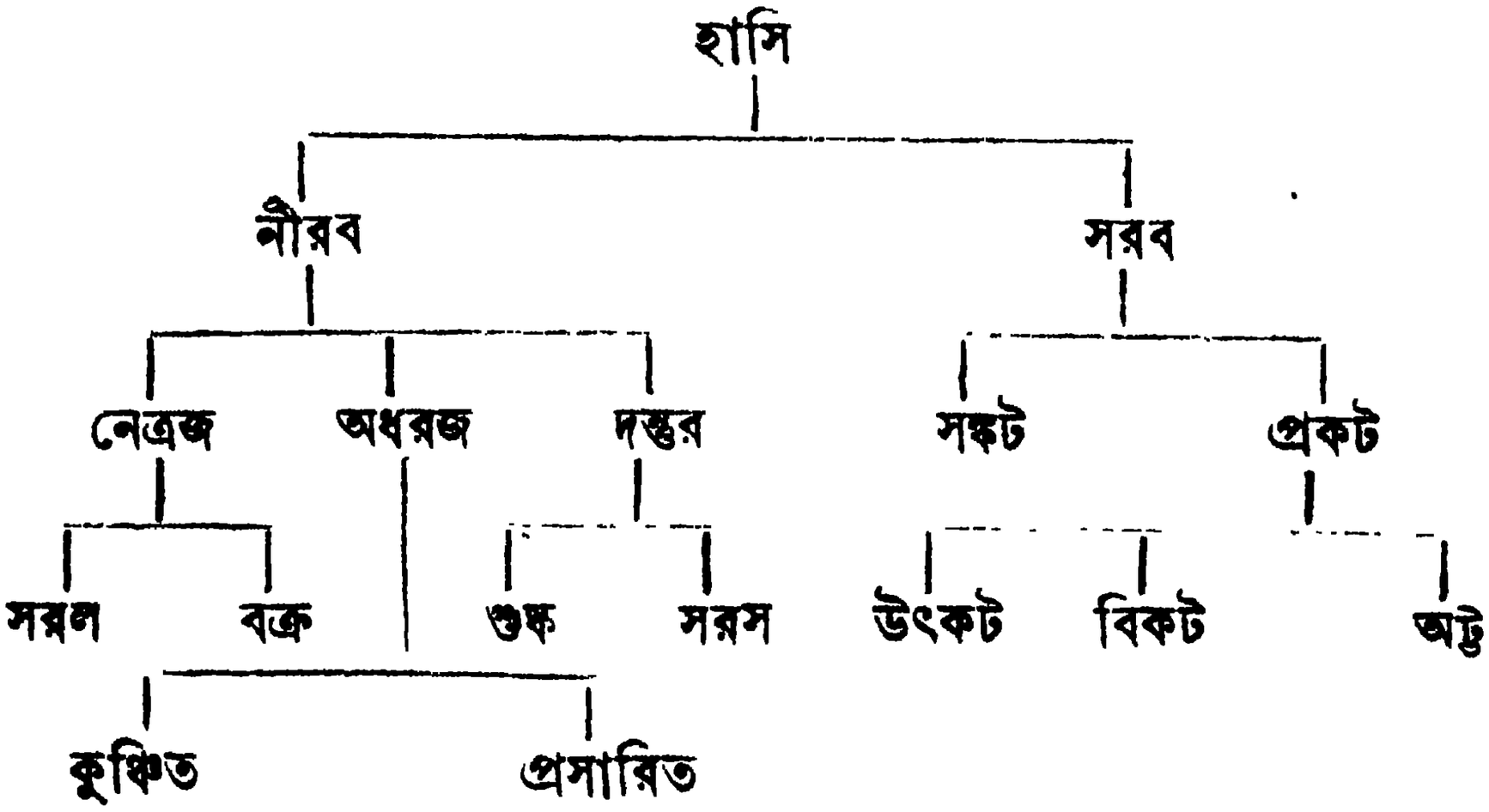

অর্থাৎ হাসি প্রধানতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত—দৃশ্য ও শ্রাব্য। ইহার প্রথমটি স্ত্রীজাতির অধিকারভুক্ত—দ্বিতীয়টি পুরুষের। ধর্ম্মের ন্যায় হাসিও অধিকার-অনুসারেই চর্চ্চা করা উচিত। তবে দৃশ্যহাস্যের দন্তুর শাখায় পুরুষেরও অধিকার আছে—এবং কোন-কোনও অবস্থায় স্ত্রীজাতিকেও বাধ্য হইয়া গুরুজনের সম্মুখে শ্রাব্যহাস্যের অন্তর্ভূত সঙ্কট হাসিরও অনধিকার চর্চ্চা করিতে হয়। যে হাসি শত চেষ্টাতেও সম্পূর্ণ চাপা যায় না, এবং যাহা ইচ্ছা ও চেষ্টার বিরুদ্ধে ফিক্‌ফিক্

ধ্বনিসহকারে গৃহশত্রুর ন্যায় বহির্গত হইয়া পড়ে,—সেই হাসির নাম সঙ্কট—কারণ উভয়সঙ্কট স্থলেই এই অবাধ্য হাসি জন্মলাভ করে। এক সরলজাতীয় ব্যতীত উপরোক্ত সকলপ্রকার হাসিই যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা শিক্ষা করা যায়।

বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল এবং জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ সরল নেত্রজ হাসি—চোখের উপরই ভাসিতে থাকে। এ অনির্ব্বচনীয় হাসির সাক্ষাৎকার লাভ করাই মহা সৌভাগ্যের কথা। এ হাসি অনুকরণ করিবার নয়—অনুসরণ করিবার বস্তু।

পূর্ব্বোল্লিখিত সকল প্রকার হাসি সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং জীবনে যদি হাসির চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার চর্চ্চা করা একান্ত কর্ত্তব্য, কেননা ভারত-উদ্ধারের অপর কোনও উপায় নাই। চোখের জলে চোখ ফোটে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

নারীর পত্র

(বীরবলের মারফৎ প্রাপ্ত)

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইউরোপের যুদ্ধের বিষয় মতামত প্রকাশ করা যে নিতান্ত হাস্যকর জিনিষ তা আমি বিলক্ষণ জানি, অথচ আমি যে সেই কাজ করতে উদ্যত হয়েছি তার কারণ, যখন অনেক গণ্যমান্য লোক এই যুদ্ধ-উপলক্ষ্যে কথায় ও কাজে নিজেদের উপহাসাস্পদ করতে কুণ্ঠিত হচ্চেন না, তখন নগণ্য আমরাই বা পিছ্‌পাও হব কেন ?

এ কথা শুনে হয় ত তোমরা বল্‌বে, পুরুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে তা নয়, অতএব পুরুষের অনুকরণ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। পুরুষালি-মেয়ে যে একটি অদ্ভুত জীব এ কথা আমরা মানি, কিন্তু মেয়েলি-পুরুষ যে তার চাইতেও বেশি অদ্ভুত জীব একথা যে তোমরা মানো না তার প্রমাণ তোমাদের কথায় ও কাজে নিত্য পাওয়া যায়।

সে যাই হোক, যুদ্ধসম্বন্ধে যে এদেশে স্ত্রীপুরুষের কোনও অধিকারভেদ নেই সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। যুদ্ধ তোমরাও কর না, আমরাও করি নে। পল্টন তোমরাও দেখেছ, আমরাও দেখেছি কিন্তু যুদ্ধ তোমরাও দেখ নি, আমরাও দেখি নি। এ বিষয়ে যা-কিছু জ্ঞান তোমরাও যেখান থেকে সংগ্রহ করেছ, আমরাও সেইখান থেকেই করেছি—অর্থাৎ ইতিহাস-নামক কেতাব থেকে।

তবে আমাদের ইতিহাস হচ্ছে রামায়ণ মহাভারত আর তোমাদের ইংরাজি ও ফরাসি। ভাষা আলাদা হলেও দুইই শোনা কথা এবং সমান বিশ্বাস্য। লড়াই অবশ্য তোমরা 'কর, কিন্তু সে ঘরের ভিতর ও আমাদের সঙ্গে, এবং তাতেও জিৎ বরাবর তোমাদেরই হয় তা নয়। বরং সত্যকথা বল্‌তে হলে, বাল্য-বিবাহের দৌলতে, বালিকা-বিদ্যালয়ের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা হেঁট করেই থাক্‌তে হয়। সুতরাং ইউরোপের এই চতুরঙ্গ খেলা সম্বন্ধে তোমরা যদি উপর-চাল দিতে পার, তবে আমরা যে কেন পারব না তা বোঝা শক্ত।

কিন্তু ভয় নেই, আমি এ পত্রে কোনরূপ অধিকার-বহির্ভূত কাজ কর্‌তে যাচ্চিনে—অর্থাৎ তোমাদের মত কোন উপর-চাল দেব না, কেননা কেউ তা নেবে না।

আমাদের মতের যে কোন মূল্য নেই তা আমরা অস্বীকার করিনে, অপরপক্ষে আমাদের অমত যে মহামূল্য, তাও তোমরা অস্বীকার কর্‌তে পার না। আমরা তোমাদের মতে চলি, তোমরা আমাদের অমতে চল না। আমাদের "না"র কাছে তোমাদের "হাঁ" নিত্য বাধা পায়। আসল কথা, এই অমতের বলে আমরা তোমাদের চালমাৎ করে রেখেছি।

এক্ষেত্রেও তাই আমি এই যুদ্ধসম্বন্ধে আমার মত নয়, অমত প্রকাশ কর্‌তে সাহসী হচ্ছি—কেননা "যুদ্ধ কর"—এ কথা যদি পুরুষে জোর করে' বলতে পারে তাহলে "যুদ্ধ কর'না"এ কথা জোর করে বলতে স্ত্রীলোকে কেন না পারবে? আমরা কাপুরুষ না হলেও না-পুরুষ ত বটেই।

যুদ্ধ যে কস্মিনকালে কোনও দেশে স্ত্রীলোকের অভিপ্রেত হতে পারে না এ বিষয়ে বেশি কথা বলা বৃথা। যুদ্ধ জিনিষটি চোখে না দেখলেও ব্যাপারখানা যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়। বঙ্গভাষার মহাকাব্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পড়া যায় আসল ঘটনা অবশ্য তার অনুরূপ নয়। ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক মিলে আজ যে খেলা খেল্‌ছে সে আর যাই হোক ছেলেখেলা নয়। সূর্য্যগ্রহণ ভূমিকম্প ঝড়জল অগ্ন্যুৎপাতের একত্র আবির্ভাবে পৃথিবীর যে রকম অবস্থা হয়—এই যুদ্ধে ইউরোপের তদ্রূপ অবস্থা হয়েছে। এই মহাপ্রলয়গ্রস্ত কোটি কোটি নরনারীর মৃত্যুযন্ত্রনার ও প্রাণভয়ের আর্ত্তনাদ আমাদের কানে অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পৌঁছয়;—সম্ভবতঃ তা তোমাদের শ্রুতিগোচরই হয় না। অপর কোন কারণ না থাকলেও এই এক কারণে মানুষের হাতে-গড়া এই মহামারী-ব্যাপার আমাদের কাছে চিরকালের জন্য হেয় হয়ে থাকত। মায়ের জাত এমন করে লোক-কাঁদাবার কখনই পক্ষপাতী হতে পারে না। আমরা নবজীবনের সৃষ্টি করি, সুতরাং সেই জীবন রক্ষা করাই আমাদের মতে মানবের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম এবং তার ধ্বংস করা মহা পাপ। তারপর, এই মহাপাপের সৃষ্টি করে পুরুষে, আর তার পুরো শাস্তি ভোগ করি আমরা। অতএব যুদ্ধব্যাপারটি আমাদের কি প্রকৃতি, কি স্বার্থ, উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

তোমরা হয় ত বলবে যে, যুদ্ধের প্রতি স্ত্রীজাতির এই সহজ বিদ্বেষের মূলে কোনওরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সেই কারণে পুরুষে যুদ্ধসম্বন্ধে স্ত্রীলোকের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে বাধ্য। পৃথিবীর বড় বড় জিনিষের ঔচিত্যানুচিত্য কেবলমাত্র হৃদয় দিয়ে

যাচাই করে নেওয়া যায় না। এসব ঘটনার সার্থকতা বোঝবার জন্য বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই।

বিদ্যা যে আমাদের নেই—সে ত তোমাদের গুণে কিন্তু সেই জন্যে বুদ্ধি যে আমাদের মোটেই নেই এ কথা আমরা স্বীকার করতে পারি নে। কারণ, ও-ধারণাটি তোমাদের প্রিয় হলেও সত্য নয়। সুতরাং যুদ্ধ করা সঙ্গত কি অসঙ্গত—তা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করতে বাধ্য।

যুদ্ধের সকল সাজসজ্জা সকল রঙচঙ ছাড়িয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ও-ব্যাপারটি হত্যা ও আত্মহত্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অথচ এটি প্রত্যক্ষ সত্য যে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, পরকে মারা কিম্বা নিজে মরা সে উদ্দেশ্য নয়।

মানুষ পশু হলেও যে হিংস্রপশু নয় তার প্রমাণ তার দেহ। আমরা হাতে, পায়ে, মুখে, মাথায় অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে' ভূমিষ্ঠ হইনে, তোমরাও হও না। মানুষের অবশ্য নখদন্ত আছে কিন্তু সে নখ ভালুকের নয় এবং সে দাঁত সাপের নয়। অনেকের অবশ্য মস্তকে গোজাতির মগজ আছে এবং অনেকের দেহে গণ্ডারের চর্ম্ম আছে কিন্তু তাই বলে এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ললাটে শৃঙ্গ এবং নাসিকায় খড়্গ ছিল। শুনতে পাই যে, আদিম মানবের বৃহৎ লাঙ্গুল ছিল—বর্ত্তমানে ও-অঙ্গটি অনাবশ্যক-বিধায় সেটি আমাদের দেহচ্যুত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি যথার্থ মানবধর্ম্ম হয় তাহলে পুরুষ-মানুষের অন্ততঃ বীর-পুরুষের মাথায় শিং এবং নাকের খাঁড়া খসে পড়বার কোনও কারণ ছিল না। মানুষের কেবল

একটিমাত্র ভগবদ্দত্ত মহাস্ত্র আছে—সেটি হচ্ছে রসনা। সুতরাং মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি ঐ অস্ত্রের সাহায্যেই করা তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্য।

তারপর, মানুষ যে আত্মহত্যা করবার জন্য এ পৃথিবীতে আসেনি, তার প্রমাণ মানুষের সকল কাজ, সকল যত্ন, সকল পরিশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন ধারণ করা। ওই এক মূল-প্রবৃত্তি হতে মানুষের শুধু সকল কর্ম্মের নয়, সকল ধর্ম্মেরও উৎপত্তি। ইহজীবনের পরিমিত সীমা অতিক্রম করবার অদম্য প্রবৃত্তি থেকেই মানুষে দেহাতিরিক্ত আত্মা এবং ইহলোকাতিরিক্ত পরলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। এই কারণে, যে কর্ম্মের দ্বারা জীবন-রক্ষা সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যে ধর্ম্মের চর্চ্চায় আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট গ্রাহ্য ধর্ম্ম। তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত দর্শনবিজ্ঞান হাজার প্রমাণাভাব দেখালেও মানুষের মন থেকে যে ধর্ম্মবিশ্বাস দূর হয় না তার কারণ মস্তিষ্ক মজ্জার বিকারমাত্র,—মজ্জা মস্তিষ্কের বিকার নয়। এবং বাঁচবার ইচ্ছা মানুষের মজ্জাগত। মানুষের কাছে সব জিনিষের চাইতে প্রাণের মূল্য অধিক বলেই প্রাণবধ করাটাই মানবসমাজে সব চাইতে বড় পাপ বলে গণ্য।

এই কারণেই "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এই বাক্যটিই ধর্ম্মের প্রথম না হোক, শেষ কথা। এই কথাটি সত্য বলে' গ্রাহ্য করে' নিলে যুদ্ধের স্বপক্ষে বলবার আর কোনও কথাই থাকে না। একের পক্ষে অপরকে বধ করা যদি পাপ হয় তাহলে অনেকে মিলে অনেককে বধ করা যে কি করে' ধর্ম্ম হ'তে পারে তা আমাদের

ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যে গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য অকর্ত্তব্যকে যোগ দিয়ে একটি মহৎ কর্ত্তব্যে পরিণত করা হয় সে শাস্ত্র আমাদের জানা নেই।

যুদ্ধের মূল যে হিংসা, এবং বীরত্ব যে হিংস্রতার নামান্তরমাত্র সে বিষয়ে অন্ধ থাকা কঠিন।

বীরপুরুষনামক জীবের সঙ্গে অবশ্য আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। যাত্রাদলের ভীম আর থিয়েটারের প্রতাপাদিত্য হচ্ছে আমাদের বীরত্বের আদর্শ। কিন্তু রঙ্গভূমির বীরত্ব এবং রণভূমির বীরত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা প্রভেদ আছে। কেননা, অভিনয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে আমোদ দেওয়া আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে পীড়ন করা। সুতরাং আসল বীররস যে পরিমাণে করুণ-রসাত্মক নকল বীররস সেই-পরিমাণে হাস্য-রসাত্মক। এর এক থেকে অবশ্য অপরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যে-সকল গুণের সমবায়ে বীরচরিত্র গঠিত হয় তার একটি বাদ আর সব গুণই আমাদের শরীরে আছে বলে, বীরত্বের বিচার কর্‌বার পক্ষে আমরা বিশেষরূপে যোগ্য।

শুন্‌তে পাই, ধৈর্য্য হচ্ছে বীর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এ গুণে তোমাদের অপেক্ষা আমরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রত নিয়ম উপবাস জাগরণে আমরা নিত্য অভ্যস্ত সুতরাং কষ্ট-সহিষ্ণুতা আমাদের অঙ্গের ভূষণ। বিনা-বিচারে, বিনা-ওজরে, পরের হুকুমে চলা নাকি যোদ্ধার একটি প্রধান ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম আমাদের মত কে পালন কর্‌তে পারে? আমাদের মত কলের পুঁতুল জর্ম্মাণীর রাজ-কারখানাতেও তৈরি হয় নি। তার পর, কারণে কিম্বা অকারণে,

অকাতরে প্রাণ-দেওয়া যদি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা হয়,—তাহলে আমরা বীরশ্রেষ্ঠ, কারণ তোমাদের পিতামহেরা যখন জ্বরে মর্‌তেন সেই সঙ্গে আমরা পুড়ে মরতুম। এসব গুণসত্ত্বেও যে আমরা বীরজাতি বলে গণ্য হই নি তার কারণ আমরা পরের জন্য মর্‌তে জানি কিন্তু পরকে মার্‌তে জানিনে। যে প্রবৃত্তির অভাববশতঃ স্ত্রীধর্ম্ম হেয় আর সদ্ভাববশতঃ ক্ষাত্রধর্ম্ম শ্রেয়ঃ—সে হচ্ছে হিংসা। বীরপুরুষ কিছুই সাধ করে ত্যাগ কর্‌তে চান না ;—সবই গায়ের জোরে ভোগ কর্‌তে চান। শাস্ত্রে বলে —"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। বীরের ধর্ম্ম হচ্ছে, পৃথিবীর সুবর্ণ-পুষ্প চয়ন করা—অবশ্য আমরাও তার অন্তর্ভূত। তাই আমাদের সঙ্গে বীরপুরুষের চিরকাল ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ। বীর প্রাণ দান কর্‌তে পারেন না—যদি যুদ্ধক্ষেত্রে দৈবাৎ তা হারান ত সে তাঁর কপাল আর তাঁর শত্রুর হাতযশ। বীরত্বের মান্য আজও যে পৃথিবীতে আছে তার কারণ বীরত্ব মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক করে, শ্রদ্ধার নয়। সুতরাং যুদ্ধের মাহাত্ম্য মানুষের বল নয় দুর্ব্বলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে কাজ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, মানুষের ভীরুতাই যার মূলভিত্তি, যে কর্ম্মের ফলে সমাজের অশেষ ক্ষতি হয়—তা যে কি করে ধর্ম্ম হতে পারে তা আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানে আসে না।

পুরাকালে পুরুষ-মানুষে যুদ্ধ করাটাই ধর্ম্ম মনে কর্‌তেন এবং স্ত্রীলোকে চিরকালই তা অধর্ম্ম মনে করত। কালক্রমে পুরুষের মনেও এ বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান জন্মেছে। এখন যুদ্ধ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—এক ধর্ম্মযুদ্ধ আর এক অধর্ম্মযুদ্ধ। শুনতে পাই, এ কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম, তার কারণের উপর নির্ভর করে। সভ্য

জাতির মতে আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ একমাত্র তাই ধর্ম্ম ;—বাদ-বাকি সকল কারণেই তা অধর্ম্ম। এ মতের প্রতিবাদ করা অসম্ভব হলেও পরীক্ষা করা আবশ্যক। কেন না, কথাটা শুন্‌তে যত সহজ আসলে তত নয়। এই দেখ না, ইউরোপে কোনো জাতিই এই যুদ্ধের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে চান না এবং পরস্পর পরস্পরকে অধর্ম্মযুদ্ধ কর্‌বার দোষে দোষী কর্‌ছেন—অথচ এঁরা সকলেই সভ্য, সকলেই বিদ্বান ও সকলেই বুদ্ধিমান। এই মতভেদের কারণ কি এই নয় যে, আত্মরক্ষা-শব্দের অর্থটি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট নয়। "আত্মা"-শব্দের অর্থ কে কি বোঝেন, আত্মজ্ঞানের পরিসরটি কার কত বিস্তৃত—তার দ্বারাই তাঁর আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসারও নির্ণীত হয়। পরদ্রব্যে যে মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মাতে পারে তার প্রমাণ পৃথিবীতে বহু ব্যক্তি এবং বহু জাতি নিত্যই দিয়ে থাকেন। সুতরাং কোন্ পক্ষ যে সুদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কর্‌ছেন আর কোন্ পক্ষ যে সুদ্ধ পরদ্রোহিতার জন্য যুদ্ধ কর্‌ছেন—নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে তা বলা কঠিন।

আত্মরক্ষা-শব্দের অবশ্য একটা জানা অর্থ আছে ; সে হচ্ছে আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজের প্রাণ ও নিজের ধন রক্ষা করা ; এবং সে ধনও বর্ত্তমান ধন,—ভূত কিম্বা ভবিষ্যৎ নয়। কেননা, গত ধন পুনরুদ্ধার কিম্বা অনাগত ধন আত্মসাৎ কর্‌বার জন্য পরকে আক্রমণ করা দরকার।

পৃথিবীর সকল জাতিই যদি উক্ত সহজ ও সঙ্কীর্ণ অর্থে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর কোনও কারণে যুদ্ধ করতে গররাজি হন তাহলে যুদ্ধ কালই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কেউ যদি আক্রমণ

না করে ত আর কাউকেও আত্মরক্ষা করতে হবে না। যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হওয়াই যদি পুরুষজাতির মনোগত অভিপ্রায় হয়, তাহলে নিরস্ত্র হওয়াই তার অতি সহজ উপায়। সুতরাং যতদিন দামামাকাড়া ঢালতলোয়ার গুলিগোলা ইত্যাদি সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হয়ে থাক্‌বে, ততদিন আত্মরক্ষা করা যে যুদ্ধের একমাত্র কিম্বা প্রধান কর্ত্তব্য এ কথা বলা চলবে, কিন্তু মানা চল্‌বে না।

আসল কথা, যুদ্ধের দ্বারা আত্মরক্ষা করা দুর্ব্বল জাতির পক্ষে অসম্ভব এবং প্রবল জাতির পক্ষে অনাবশ্যক।

দুর্ব্বলের পক্ষে ও-উপায়ে আত্মরক্ষা কর্‌বার চেষ্টা করার অর্থ আত্মহত্যা করা। হাতে হাতে প্রমাণ—বেল্‌জিয়াম।

যুদ্ধ আমাদের মতে একমাত্র সেই-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম যে-ক্ষেত্রে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপে, দুর্ব্বল এই উপায়ে আত্মরক্ষা নয়, আত্মবিসর্জ্জন করে। উদাহরণ—বেল্‌জিয়াম।

সত্য কথা বল্‌তে গেলে, মানুষে হয় অর্থের জন্য নয় প্রভুত্বের জন্য, হয় রাজ্যের জন্য নয় গৌরবের জন্য—পরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। পরার্থ-নাশ এবং স্বার্থসাধনের জন্যই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়। যুদ্ধের মূলে আত্মজ্ঞান নেই, আছে শুধু অহংজ্ঞান। যুদ্ধের উৎপত্তি থেকেই তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যুদ্ধ যে ধর্ম্মকার্য্য এ প্রমাণ করতে হলে, তৎপূর্ব্বে "হিংসা পরম ধর্ম্ম" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তোমরা অবশ্য এ কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ হও নি। বুদ্ধের ধর্ম্ম যে বুদ্ধির ধর্ম্ম নয় এই প্রমাণ কর্‌বার জন্য, শুন্‌তে পাই, বুদ্ধিমান পুরুষে নানা দর্শন ও বিজ্ঞান রচনা করেছেন।

বাঙ্গলার মাসিকপত্রের প্রসাদে এসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধানগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরাও লাভ করেছি। দেশের ও বিদেশের এই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মাথার না হোক, বুকের মাপ আমরা নিতে জানি। বড় বড় কথার আড়ালেও তোমাদের হৃদয়-বিকার আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তাই তোমাদের দর্শনবিজ্ঞানে তোমাদের ঠকাতে পারে, আমাদের পারে না।

শুন্‌তে পাই, অক্লান্ত গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষ পুচ্ছ-বিষাণহীন হলেও পশু। এবং যেহেতু পশুর জীবন সংগ্রাম-সাপেক্ষ অতএব দুর্ব্বলের উপর আক্রমণ এবং প্রবলের নিকট হতে পলায়ন করাই মানুষের স্বধর্ম্ম। ছল ও বল প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ তার অন্তর্নিহিত মানসিক ও শারীরিক শক্তির পূর্ণ পরিণতি লাভ কর্‌তে পারে। সুতরাং পশুত্বের চর্চ্চা করাই হচ্ছে যথার্থ মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করা। যে-সভ্যতা নিষ্ঠুরতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে-সভ্যতা শক্তিহীন ও প্রাণহীন, কেন না হিংসাই হচ্ছে জীবজগতের মূল সত্য। এবং সেই সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘাত-প্রতিঘাতই মানবের উন্নতির একমাত্র কারণ। এবং নিজের নিজের উন্নতি সাধন করাই যে পরম পুরুষার্থ—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমরা অজ্ঞযুগের উত্তরাধিকারীসূত্রে যে সকল নীতিজ্ঞান লাভ করেছি তার চর্চ্চায় মানুষকে শুধু দুর্ব্বল করে। সুতরাং নবনীতির বিধান এই যে, নির্ম্মমভাবে যুদ্ধ কর, অবশ্য দুর্ব্বলের সঙ্গে।

এতটা নগ্ন সত্য মানুষে সহজে বুকে তুলে নিতে পারে না;—কেননা তা তার যুগসঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যায়। সাধারণ

লোকের সে পরিমাণ বুদ্ধিবল নেই, যাতে করে' জীবজগতে অবরোহণ করাই যে আরোহণ কর্‌বার একমাত্র উপায়—এ সত্য সহজে আয়ত্ত কর্‌তে পারে। তা ছাড়া, সকলের সে পরিমাণ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি নেই যার সাহায্যে নিজের বুকের ভিতর হিংস্র পশুর সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌তে পারে।

সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে সাধারণের নিকট গ্রাহ্য করাতে হলে তাকে ধর্ম্ম ও নীতির সাজে সজ্জিত করে বার করা দরকার। অতঃপর বৈজ্ঞানিকরা সেই উপায়ই অবলম্বন করেছেন।

সুনীতির ছদ্মবেশধারী বৈজ্ঞানিক মত এই। প্রতি লোক নিরীহ হলেও তাদের সমষ্টিতে সমাজনামক যে বিরাট-পুরুষের সৃষ্টি হয়, সে একটি ভীষণ জীব। এই বিরাট-পুরুষের প্রাণ আছে, আত্মা নেই—রতি আছে, বুদ্ধি নেই—গতি আছে, দৃষ্টি নেই। সমাজ শুধু বাঁচতে চায় ও বাড়্‌তে চায়, এই তার জীবনের ধর্ম্ম; —অন্য কোনও ধর্ম্মাধর্ম্ম তাকে স্পর্শ করে না। সমাজ হচ্ছে একমাত্র অঙ্গী এবং ব্যক্তিমাত্রেই তার অঙ্গ। সুতরাং ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের অধীন কিন্তু সমাজ কোনও ব্যক্তিবিশেষের অধীন নয়। এবং যেহেতু সমাজের বাইরে আমাদের কোনও অস্তিত্ব নেই—সে কারণ সমাজকে রক্ষা করা এবং তার অভ্যুদয় সাধন করাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সহস্র সহস্র লোকের আত্মবলিদানের ফলে এই বিরাট-পুরুষের দেহ পুষ্ট হয়। লোকে বলে যে, যে মণ্ডপের আঙ্গিনায় লক্ষ বলি হয়, সেখানে একটি কবন্ধ-ভূত জন্মায়;—যার নরবলি ব্যতীত আর-কোনও উপায়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা যায় না; এবং সে বুভুক্ষিত থাকলে সাধকের

ঘাড়-মটকে খায়। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সমাজ-নামক বিরাট-পুরুষ এই জাতীয় একটি প্রেতযোনি বই আর কিছুই নয়। এই বিরাট-কবন্ধের শোণিত-পিপাসা নিবারণার্থ নরবলি দেওয়া ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে যতগুলি বিভিন্ন সমাজ আছে, ততগুলি পৃথক বিরাট-পুরুষও আছে। এবং এই সকল নরমাংস-লোলুপ দৈত্যদের মধ্যে চিরশত্রুতা বিদ্যমান। সুতরাং মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য—নিজ-সমাজের নিকট পর-সমাজকে বলি দেওয়া—অর্থাৎ যুদ্ধ করা। এই মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকরা মানবের নৈতিক বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, শুধু তার বিকার সাধন করে' সেটিকে বিপথে চালাতে চান্। এঁদের সাদা কথা এই যে—নিজের স্বার্থের জন্য করলে যে কাজ মহাপাপ, জাতীয় স্বার্থের জন্য করলে সেই একই কাজ মহাপুণ্য। সমাজনামক অপদেবতাকে নিবেদন করে দিলে খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি—ফুলের মত শুভ্র, দীপের ন্যায় উজ্জ্বল, ধূপের ন্যায় সুরভি হয়ে উঠে। বহু মানবকে একত্রে যোগ দিলে কি করে' একটি দানবের সৃষ্টি হয় তা আমাদের স্ত্রীবুদ্ধির অতীত। আর এই কথাটা জিজ্ঞাস্য থেকে যায় যে, লোকসমষ্টিকে সমাজ নাম দিয়ে তার উপরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করার যদি কোনও বৈধ কারণ থাকে তাহলে এই ব্যক্তিটির অন্তরে একটি আত্মার আরোপ করা কি কারণে অবৈধ? এই বিরাট-পুরুষকে মানবধর্ম্মী কল্পনা করলে আমাদের সহজ ন্যায়বুদ্ধিকে ডিগবাজি-খাওয়াবার জন্য তোমাদের আর এত গলদ্ঘর্ম্ম হতে হত না।

বিজ্ঞান মানুষকে মরতে শেখালেও মারতে শেখাতে পারে

না। এই জন্যই দর্শনের আবশ্যক। মানুষে সহজে দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা-পাখীটিকে মুক্তি দিতে চায় না, কেননা ভবিষ্যতে তার গতি কি হবে সে বিষয়ে সকলেই অজ্ঞ। আত্মার সঙ্গে বর্ত্তমানে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে এবং তার ভবিষ্যৎ-অস্তিত্বের আশা আমরা সকলেই পোষণ করি। এর বেশি আমরা আর-কিছুই জানি নে। অপর-পক্ষে, দার্শনিকেরা আত্মার ভূত-ভবিষ্যতের সকল খবরই জানেন। সুতরাং অমরত্বের আশাকে বিশ্বাসে পরিণত করবার ভার তাঁদের হাতে। এবং তাঁরাও তাঁদের কর্ত্তব্যপালন করতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য মারা, মরা নয়; তবে হত্যা করতে গেলে হত হবার সম্ভাবনা আছে বলে' দার্শনিকেরা এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করলে আত্মা একলম্ফে স্বর্গারোহণ করে এবং সেদেশে উপস্থিত হবামাত্র এত ভোগ-বিলাসের অধিকারী হয় যে, তা এ পৃথিবীর রাজরাজেশ্বরেরও কল্পনার অতীত। কিন্তু অধ্রুব ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের লোভে ধ্রুব ত্যাগ করা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সকাল-সকাল স্বর্গপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যোদ্ধাদের তাদৃশ উৎসাহ না থাকায়, তাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে নরকেরও ভয় দেখান হয়। কিন্তু তাতেও যদি ফল না হয় ত সেনাপতিরা যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ সৈনিকদের বধ করতে পারেন—এ বিষয়েও দার্শনিক বিধি আছে। অর্থাৎ মৃত্যুভয় দেখিয়ে মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অত কাঁচা ওষুধ সকলের ধরে না। পৃথিবীতে এমন লোক দুর্লভ নয়, যাঁরা মানুষকে মারতে প্রস্তুত মন,—

স্বর্গের লোভেও নয়, নরকের ভয়েও নয়। এঁদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার উপযোগী দর্শনও আছে। যাঁরা নিজের স্বার্থের জন্য পরের ক্ষতি কর্‌তে প্রস্তুত নন—তাঁদের নিঃস্বার্থতার দিক্ দিয়ে বাগাতে হয়। যিনি মর্ত্ত্যরাজ্য, কি স্বর্গরাজ্য—কোন রাজ্যই কামনা করেন না—তাঁকে নিষ্কাম হত্যা কর্‌বার উপদেশ দেওয়া হয়। হত্যা পাপ নয়;—কারণ ও একটি কর্ম্ম। কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, তার ফল কামনা করাই অধর্ম্ম। হত্যা করা যে পাপ এ ভ্রান্তি শুধু তাদেরই হয় যারা আত্মার ভূতভবিষ্যতের বিষয় অজ্ঞ। আত্মা যখন অবিনশ্বর তখন কেউ কাউকে বধ কর্‌তে পারে না। দেহ আত্মার বসনমাত্র। সুতরাং প্রাণবধ করার অর্থ আত্মাকে পুরোনো কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরানো। অপরকে নূতন বস্ত্র দান করা যে পুণ্যকার্য্য সে ত সর্ব্ববাদীসম্মত। মানুষ যদি তার ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করে' নিজের অমরত্ব অর্থাৎ দেবত্ব অনুভব করে, তাহলে নিষ্ফল হত্যা কর্‌তে তার আর কোনও দ্বিধা হবে না। অপরকে বধ করবার সুফলটি নিজে ভোগ না করলেও আর-দশজনকে যে তার কুফল ভোগ কর্‌তে হয় তা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হতে আত্মজ্ঞানী পুরুষ চিরমুক্ত। অতএব নির্ম্মম-ভাবে যুদ্ধ কর।

পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক মত বিদেশের এবং দার্শনিক মত এদেশের। বলা বাহুল্য যে, দুই একই-মতের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

এই সব দর্শনবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে,

যুদ্ধ করাটা মানবধর্ম্ম নয়। যদি তা হত ত মানবকে হয় দানব, নয় দেবতা, নয় পশু প্রমাণ করতে দর্শনবিজ্ঞানের সিংহ-ব্যাঘ্রেরা এডটা গর্জ্জন করতেন না।

আসল কথা, বুদ্ধি-ব্যবসায়ীরা মানবসমাজকে মাথার উপর দাঁড় করাতে চান্, কাজেই তা উল্টে পড়ে।

এ সকল দর্শনবিজ্ঞান যে মনের বিকারের লক্ষণ তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। জ্বরে মাথায় খুন্ চড়ে গেলে মানুষে যে প্রলাপ বকে তার পরিচয় এই ম্যালেরিয়ার দেশে আমরা নিত্যই পাই। দুঃখের বিষয় এই যুদ্ধজ্বর যেমন মারাত্মক তেমনি সংক্রামক। এ হচ্ছে মনের প্লেগ। এ যুগে শরীরের প্লেগ হয় এসিয়ায় আর মনের প্লেগ হয় ইউরোপে—এ দুয়ের ভিতর এই যা প্রভেদ। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে দেশথেকে প্লেগ তাড়িয়েছে, মনথেকে কি তা তাড়াতে পার্‌বে না ?

এ পাপ দূর কর্‌তে যে মনের বল, যে চরিত্রের বল চাই, এক-কথায় যে বীরত্ব চাই—সে বীরত্ব তোমাদের নরসিংহ ও নরশার্দ্দূলদের দেহে নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষচরিত্র অনুকরণ করা যে হাস্যকর তার কারণ মানবজাতি যদি যথার্থ সভ্য হতে চায় ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-চরিত্রের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। তোমাদের দেহের বলের সঙ্গে আমাদের মনের বলের, তোমাদের বুদ্ধিবলের সঙ্গে আমাদের চরিত্রবলের যদি রাসায়নিক যোগ হয় তাহলেই তোমরা যথার্থ বীর-পুরুষ হবে, নচেৎ নয়। কারণ খাঁটি বীরত্বের ধর্ম্ম হচ্ছে পরকে মারা নয়, বাঁচানো—পরের জন্য নিজে মরা নয়, বেঁচে থাকা। মানুষে ক্ষণিক নেশার ঝোঁকে পরের জন্য দেহত্যাগ

কর্‌তে পারে কিন্তু পরের জন্য চিরজীবন আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার আবশ্যক। সুতরাং যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম হচ্ছে স্ত্রীধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়।

এর উত্তরে ঐতিহাসিক বল্‌বেন—আজ তিন হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ঢের বদল হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ বরাবর সমানই চলে আস্‌ছে, সুতরাং তা চিরদিনই থাক্‌বে। এর প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পুরুষজাতির ভিতর যদি এমন একটি আদিম পশুত্ব থাকে যার উচ্ছেদ অসম্ভব, তাহলে তাদের লালনপালন কর্‌বার মত তাদের শাসন কর্‌বার ভারও আমাদের হাতে আসা উচিত। আমরা শাসনকর্ত্রী হলে পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রকে শ্রীক্ষেত্রে পরিণত কর্‌ব এবং তোমাদের পোষ মানিয়ে জগবন্ধুর রথ টানাব। ইতি

জনৈক বঙ্গনারী।

নারীর পত্রের উত্তর

আমরা স্ত্রীজাতিকে সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। আজকাল বাঙ্গলা ভাষায় লেখকের চাইতে লেখিকার সংখ্যাই বেশি। সম্ভবতঃ সেই কারণে মাসিকপত্রসকল 'পত্রিকা'-সংজ্ঞা ধারণ করেছে। স্ত্রীজাতি এতদিন সে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন নি, কেননা মতামতে তাঁরা একালযাবৎ আমাদেরই অনুসরণ করে আস্‌ছেন। বাঙ্গলায় স্ত্রী-সাহিত্য জল-মেশানো পুং-সাহিত্য বই আর কিছুই নয়, সুতরাং সে সাহিত্য পরিমাণে বেশি হলেও আমাদের সাহিত্যের চাইতেও ওজনে ঢের কম ছিল।

কিন্তু লেখিকারা যদি স্ত্রী-মনোভাব প্রকাশ কর্‌তে সুরু করেন তাহলে তাঁদের কথা আর উপেক্ষা করা চল্‌বে না। এই কারণে, এই সঙ্গে যে "নারীর পত্রখানি" পাঠাচ্ছি তার মতামতসম্বন্ধে সসঙ্কোচে দুটি একটি কথা বল্‌তে চাই।

লেখিকার মূল-কথার বিরুদ্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই। সে কথা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ না-করা স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রমাণ কর্‌বার জন্য অত বাগ্‌জাল বিস্তার করবার আবশ্যক ছিল না। অপর-পক্ষে, যুদ্ধ করা যে, পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক তা প্রমাণ করাও অনাবশ্যক। এই সত্যটি মেনে নিলে লেখিকা দর্শনবিজ্ঞানের প্রতি অত আক্রোশ প্রকাশ কর্‌তেন না। দর্শনবিজ্ঞান যুদ্ধের সৃষ্টি করে নি,—যুদ্ধই তদনুরূপ দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র হচ্ছে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক,

তাই ব্রাহ্মণের শাস্ত্র ক্ষত্রিয়ের চিত্ততোষক হতে বাধ্য। এ দুই জাতির ভিতর স্পষ্ট সাংসারিক বাধ্য বাধকতার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু যুদ্ধজীবীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর যে একটি মানসিক বাধ্যবাধকতাও আছে তা সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়। একদল মানুষে যা করে আর-এক দলে হয় তার ব্যাখ্যান্, নয় ব্যাখ্যা করে। কর্ম্মবীর জ্ঞানহীন হতে পারে, এবং জ্ঞানবীর কর্ম্মহীন হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে কর্ম্ম না থাকলে জ্ঞানও থাকৃত না। কর্ম্ম জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, জ্ঞান কর্ম্মবৃক্ষের ফুল। সুতরাং যুদ্ধের দায়িত্ব দর্শন-বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপানো। মানুষ যতদিন যুদ্ধ করবে, মানুষে ততদিন হয় তার সমর্থন, নয় তার প্রতিবাদ করবে। মানুষকে ঝগড়ালড়াই করতে উস্‌কে দেওয়াই যে জ্ঞানের একমাত্র কাজ তা অবশ্য নয়। জ্ঞানীমাত্রেই যে নারদ নন, তার প্রমাণ স্বয়ং বুদ্ধদেব।

লেখিকা ধর্ম্মযুদ্ধ এবং অধর্ম্মযুদ্ধের পার্থক্য স্বচ্ছন্দচিত্তে মান্‌তে চান না। তাঁর মতে এই "অভেদ পার্থক্যের" আবিষ্কারে পুরুষজাতি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, হৃদয়ের নয়। হৃদয় ও বুদ্ধির পার্থক্যও যে কাল্পনিক—এ সত্যটি মনে রাখলে—যা আসলে অবিচ্ছেদ্য তার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার এক অংশ আমাদের দিয়ে অপর অংশ স্ত্রীজাতি অধিকার করে বস্‌তেন না। বুদ্ধিও আমাদের একচেটে নয়, হৃদয়ও ওঁদের একচেটে নয়, এবং যেমন হৃদয়ের অভাবের নাম বুদ্ধি নয় তেমনি বুদ্ধির অভাবের নামও হৃদয় নয়। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে পুরুষজাতি বুদ্ধি ও হৃদয় দুয়েরই সমান পরিচয়

দিয়েছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন হলেও ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধসম্বন্ধে বিধিনিষেধ মান্য।

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এই বাক্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূলকথা হলেও বৌদ্ধ শাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ পেটের-দায়ে যুদ্ধ করে। উদরকে মস্তিষ্ক যে পুরোপুরি নিজের শাসনাধীন করতে পারে না তার জন্য দায়ী মানুষের প্রকৃতি নয়, তার আকৃতি। দেহ ও মনে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন শান্তির জন্য একেও কিছু ছেড়ে দিতে হয় ওকেও কিছু ছেড়ে দিতে হয়। হিংসা এবং অহিংসার সন্ধি থেকেই বৈধ হিংসার সৃষ্টি হয়। আর, সন্ধ্যা জিনিসটি, তা সে প্রাতঃই হোক আর সায়ংই হোক, পুরো আলোও নয়, পুরো অন্ধকারও নয়। সুতরাং যুদ্ধ জিনিষটি একদম সাদাও নয়, একদম কালও নয়;—ওই দুয়ে মিলে যা হয় তাই, অর্থাৎ ছাই।

লেখিকা আমাদের প্রতি, অর্থাৎ বাঙ্গালী পুরুষের প্রতি, যে কটাক্ষ করেছেন সে অবশ্য সে-জাতীয় বক্রদৃষ্টি নয় যার সম্বন্ধে কবিতা লিখে লিখে আমরা এলি নে। এ সম্বন্ধে আমি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করব না, কেননা—লেখিকা স্বীকার করেছেন যে, রসনা হচ্ছে মহাস্ত্র। দুর্ব্বল আমরা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে জানিনে; কিন্তু অবলা ওঁরা যে ও-মহাস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন সে বিষয়ে কেউ আর সন্দেহ করেন না, কেননা সকলেই ভুক্তভোগী।

সে যাই হোক, সাধারণ পুরুষজাতিসম্বন্ধে তাঁর মতের প্রতিবাদ করা যেতে পারে। তিনি পুরুষের স্বভাব অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, কেননা তা স্ত্রীস্বভাব নয়। মানুষের স্বভাব যে কি লেখিকা যদি তা জানেন তাহলে তিনি এমনি-একটি জিনিষের

সন্ধান পেয়েছেন যা আমরা যুগযুগান্তের অনুসন্ধানেও পাই নি। আমরা যেমন কোনও অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে জন্মগ্রহণ করিনি, তেমনি কোনও প্রাক্তন সংস্কার নিয়ে জন্মাই নি। আমরা দেহ ও মনের নগ্ন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আসি। তাই আমরা মনুষ্যত্বের তত্ত্বের জন্য কখন পশুর কাছে, কখন দেবতার কাছে যাই; কারণ এসব জাতীয় জীবের একটা বাঁধাবাঁধি বিধি-নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে,—শুধু আমাদের নেই। আমরা শুধু স্বাধীন, বাদবাকী সৃষ্টি নিয়মের অধীন, সুতরাং আমরা মানবজীবনের যখনই একটি বাঁধাবাঁধি নিয়মের আশ্রয় পেতে চাই তখনই আমাদের মনুষ্যেতর জীবের দ্বারস্থ হতে হয়। নৃসিংহও আমাদের আদর্শ, নরহরিও আমাদের আদর্শ, শুধু আমরা আমাদের আদর্শ নই। মনুষ্যত্ব পড়ে' পাওয়া যায় না কিন্তু গড়ে' নিতে হয়—এই সত্য মানুষে যতদিন না গ্রাহ্য করবে ততদিন ভিক্ষুকের মত তাকে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। যদি বল যে, প্রত্যক্ষ পশু কিম্বা অপ্রত্যক্ষ দেবতা মানুষের আদর্শ হতে পারে না, তাহলে মানুষে উদ্ভিদকে তার আদর্শ করে তুলবে। এ-কাজ মানুষে পূর্ব্বে করেছে এবং বাধ্য হলে পরেও করবে। মানুষ যদি মানুষ না হতে শেখে তাহলে উদ্ভিদ হওয়ার চাইতে তার পক্ষে পশু হওয়া ভাল,—কেননা পশু জঙ্গম, আর উদ্ভিদ স্থাবর। মনুষ্যত্বকে স্থাবর করতে হলে মানুষকে জড় মূক অন্ধ ও বধির হতে হবে। আর তা ছাড়া উদ্ভিদ হলে আমরা ভক্ষক না হই ভক্ষ্য হব।

লেখিকা যদি এখানে প্রশ্ন করেন যে, কোনও একটা আদর্শ না পেলে কার সাহায্যে মানুষ একটি স্থায়ী মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবে,

তার উত্তরে আমি বলব, মানুষের মানুষকে নিয়ে experiment কর্‌তে হবে। যেমন, আমরা একটা লেখা গড়ে'-তুলতে হলে যতক্ষণ আমাদের ক্ষমতার সীমায় না পৌঁছই ততক্ষণ ক্রমান্বয়ে কাটি আর লিখি, তেমনি সভ্যতা-পদার্থটিও ততক্ষণ বারবার ভেঙ্গে গড়তে হবে, যতক্ষণ মানুষ তার ক্ষমতার সীমায় না পৌঁছয়। সে দিন যে কবে আস্‌বে কেউ বল্‌তে পারে না; সম্ভবতঃ কখনই আস্‌বে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান যে পরিমাণে এই experiment-এর কাজ করে সে পরিমাণে তা সার্থক এবং যে পরিমাণে তা নূতন experiment-কে বাধা দেয় সে পরিমাণে তা অনর্থক। মানুষসম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, তার সম্বন্ধে কোনও শেষ কথা নেই।

সাধারণতঃ যুদ্ধব্যাপারটি উচিত কি অনুচিত সে আলোচনার সার্থকতা যাই হোক, কোনও-একটি বিশেষ-যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, সে বিচারের মূল্য মানুষের কাছে ঢের বেশি।

এই বর্ত্তমান যুদ্ধই ধরনা কেন। পৃথিবীসুদ্ধ লোক এই ভেবে উদ্বেজিত উত্তেজিত এবং উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে যে, ইউরোপের হাতে গড়া সভ্যতা এইবার ইউরোপ বুঝি নিজে হাতে ভাঙ্গে! যদি ইউরোপের সভ্যতা এই ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়ে ত বুঝতে হবে যে, সে সভ্যতার ভিৎ অতি কাঁচা ছিল। তাই যদি প্রমাণ হয়, তাহলে ইউরোপকে এই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে ভবিষ্যতে এর চাইতে পাকা সভ্যতা গড়্‌তে হবে। ঠেকো-দিয়ে রাখার চাইতে ঝাঁকিয়ে দেখা ভাল যে, যে ঘরের নীচে আমরা মাথা রাখি সে ঘরটি ঘুণে-খাওয়া কি টেক-

সই। কিন্তু এই ভূমিকম্পে যে, ইউরোপের অট্টালিকা একেবারে ধরাশায়ী হবে সে আশঙ্কা কর্‌বার কোনও কারণ নেই। ধূলিসাৎ হবে শুধু তার দর্পের চূড়া আর তার ঠেকো-দিয়ে-রাখা প্রাচীন অংশ, আর তার গোঁজা-মিলন দিয়ে তৈরি নতুন অংশ। এতে মানবজাতির লাভ বই লোকসান নেই। তা ছাড়া, এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের একটি মহা লাভ হবে—তার এই চৈতন্য হবে যে, সে এখনও পুরোপুরি সভ্য হয়নি। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ হয়ে ইউরোপ আত্মজ্ঞান হারাতে বসেছিল, এই যুদ্ধের ফলে সে আবার আত্মপরিচয় লাভ কর্‌বে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। লেখিকা বলেছেন যে, যুদ্ধরূপ মানসিক প্লেগ ইউরোপে আছে, এসিয়ায় নেই। এসিয়ার লোকের যে মনে পাপ নেই সে কথা বলা চলে না; কেননা লেখিকাই দেখিয়েছেন যে, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য উভয় শাস্ত্রই যুদ্ধসম্বন্ধে একই মন্ত্র পুরুষজাতির কানে দিয়েছেন। তবে এসিয়া যে শান্ত আর ইউরোপ যে দুর্দ্দান্ত তার কারণ মন ছাড়া অন্যত্র খুঁজতে হবে। প্রাচ্য-দর্শন শুধু মন্ত্র দিতে পারে—কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শুধু মন্ত্র নয়, সেই মন্ত্রের সাধনোপযোগী যন্ত্রও মানুষের হাতে দিয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের জন্য শুধু শাস্ত্র নয়, অস্ত্রশস্ত্রও গড়ে দিয়েছে। সে অস্ত্রের সাহায্যে মানুষে পঞ্চভূতকে নিজের বশীভূত করেছে কিন্তু নিজেকে বশ কর্‌তে পারে নি। সুতরাং অনেকে মনে করতেন যে, বিজ্ঞান হয় ত অমানুষের হাতে খন্তা দিয়েছে। যদি এ যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে যায় যে ঘটনাও তাই, তাহলে ইউরোপীয়েরা মানুষ হতে চেষ্টা কর্‌বে; কারণ ও খন্তা

কেউ ত্যাগ কর্‌তে পারবে না ;—শুধু সেটিকে ভবিষ্যতে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রহিসেবে ব্যবহার না করে—জড়প্রকৃতির শাসনের যন্ত্রহিসেবে ব্যবহার কর্‌বে ; অর্থাৎ প্রলয় নয়, সৃষ্টির কাজে তা নিয়োজিত হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইউরোপের নাম উল্লেখ কর্‌বার অর্থ এই যে, এসিয়াবাসীদের কতদূর মনুষ্যত্ব আছে, না আছে—এ বৈজ্ঞানিক যুগে তার পরীক্ষা হয় নি। ও খন্তা হাতে পড়্‌লে বোঝা যেত যে আমরা বাঁদর কি মানুষ।

এই যুদ্ধের বেদনা থেকে ইউরোপের ন্যায়-বুদ্ধি যে জাগ্রত হয়ে উঠবে তার আর সন্দেহ নেই ;—কেননা ইতিমধ্যেই সে দেশে মানুষে ত্রাহি মধুসূদন বলে চীৎকার কর্‌ছে—প্রহারেণ ধনঞ্জয় বলে নয়।

কিন্তু পুরুষমানুষ যে কখনও মানুষ হবে এ বিশ্বাস লেখিকার নেই। তিনি পুরুষকে ইতিহাসের অতিবিস্তৃত ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন যে, সে কত ক্ষুদ্র। এবং ঐরূপে তার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করে, প্রস্তাব করেছেন যে, হয় সে স্ত্রীধর্ম্ম অবলম্বন করুক, নয় তার শাসনের ভার স্ত্রীজাতির হাতে দেওয়া হোক। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি স্ত্রীধর্ম্মী হওয়াই পুরুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব-লাভের একমাত্র উপায় হয় তাহলে আমাদের মেয়েলি বলে' কেন উপহাস করা হয়েছে ? সম্ভবতঃ লেখিকার মতে আমরা স্ত্রীজাতির গুণগুলি শিক্ষা কর্‌তে পারিনি, শুধু তাদের দোষগুলিই আত্মসাৎ করেছি। আমাদের ত্রুটিগুলির অপরকে অনুকরণ কর্‌তে দেখলে আমরা সকলেই বিরক্ত হই ;— কেননা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও-কার্য্য করলেও তা ভেংচানির মতই দেখায়। কিন্তু এ কথাও সমান সত্য যে, মানুষে

অপরের গুণের অনুসরণ কর্‌তে পারলেও অনুকরণ শুধু পরের দোষেরই করতে পারে। এর পরিচয় জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। কিন্তু অবস্থার গুণে আমরা কিছু কর্‌তে হলেই অনুকরণ করতে বাধ্য। আমরা experimentএর সাহায্যে নিজের জীবন গঠন করতে সাহস পাই নে বলে' আমাদের সুমুখে একটা তৈরি আদর্শ থাকা আবশ্যক, যার অনুকরণে আমরা নিজেদের গড়ে' নিতে পারি। আমরা এ রকম দুটি আদর্শের সন্ধান পেয়েছি ;—একটি হচ্ছে বর্ত্তমান ইউরোপীয়, অপরটি প্রাচীন হিন্দু। তার উপর যদি আবার স্ত্রীজাতিকেও আদর্শ করতে হয় তাহলে এই তিন জাতির দোষ একাধারে মিলিত হয়ে যে চীজ্‌ দাঁড়াবে জগতে আর তার তুলনা থাক্‌বে না। সৃষ্টি হচ্ছে ত্রিগুণাত্মক, আমরা ত্রিদোষাত্মক হলে যে সৃষ্টিছাড়া হব তার আর কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং এখন বিবেচ্য তোমাদের হাতে শাসনকর্ত্তৃত্ব দেওয়া কর্ত্তব্য কি না। এতে পৃথিবীর অপর-দেশের পুরুষজাতির ক্ষতিবৃদ্ধি কি হবে তা বল্‌তে পারি নে—কিন্তু আমাদের কোনও লোকসান্‌ নেই। কারণ আমরা ত চিরদিনই তোমাদের শাসনাধীন রয়েছি। আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণও ওই। লেখিকা ত নিজেই স্বীকার করেছেন—স্ত্রীলোকে অশিক্ষার গুণে এদেশে পুরুষ-সমাজকে চালমাৎ করে রেখেছে। আসল কথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষের অধীন থাকা ভাল নয়, পুরুষেরও স্ত্রীলোকের অধীন থাকা ভাল নয়। দাসত্বও মনুষ্যত্বকে যেমন বিকৃত করে, প্রভুত্বও তেমনি করে। স্ত্রীপুরুষে যে অহর্নিশি লড়াই করে তার কারণ, একজন আর-একজনের অধীন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধ

ততদিন থাক্‌বে, যতদিন এ পৃথিবীতে একদিকে প্রভুত্ব আর অপরদিকে দাসত্ব থাক্‌বে।

কিন্তু ও ব্যাপার যে পৃথিবীতে আর বেশি দিন থাক্‌বে না, এই যুদ্ধেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে। যুদ্ধ আসলে একটি ভীষণ তর্ক বই আর কিছুই নয়। যে বিষয়ের শুধু কাগজে-কলমে মীমাংসা হয় না, তার সময়ে সময়ে হাতে-কলমে মীমাংসা কর্‌তে হয়। ইউরোপে কামান-বন্দুকে যে তর্ক চল্‌ছে তার বিষয় হচ্ছে —"যুদ্ধ করা উচিত কি অনুচিত।" এক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ হচ্ছে জার্ম্মানী আর উত্তরপক্ষ হচ্ছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে যদি উত্তরপক্ষ জয়ী হয় (এবং জয় যে ন্যায়ের অনুসরণ কর্‌বে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই) তাহলে মানব-জাতি এই চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হবে যে, যুদ্ধ অকর্ত্তব্য। আর-একটি কথা,—পুরুষমানুষে যুদ্ধরূপ প্রচণ্ড বিবাদ কখন-কখন করে, কিন্তু লেখিকার স্বজাতিই হচ্ছে সকল নিত্য-নৈমিত্তিক বিবাদের মূল। এর জন্য আমাদের বুদ্ধি কিম্বা তাঁদের হৃদয় দায়ী তার বিচার আমি কর্‌তে চাই নে। আমরা মনসা হতে পারি কিন্তু ধূনোর গন্ধ ওঁরাই যোগান্। ওঁরা উস্‌কে দিয়ে পুরুষকে যে পরিমাণে "বীরপুরুষ" করে তুল্‌তে পারেন, তা কোনও দর্শন-বিজ্ঞানে পারে না। তবে যে, লেখিকা শমদমপ্রভৃতি সদ্‌গুণে নিজেদের বিভূষিত মনে করেন, সে ভুল ধারণার জন্যও দায়ী আমরা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, স্ত্রীজাতীকে আমরা সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। এ কাজটি ন্যায় হলেও সেই সঙ্গে একটি অন্যায় কাজও আমরা করেছি। স্ত্রীজাতির আমাদের

সমাজে কোনরূপ মর্য্যাদা নেই কিন্তু সাহিত্যে যথেষ্টর চাইতেও বেশী আছে। এর কারণ, সকলসমাজের উপর হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর্‌তে হলে—তোমাদের গুণকীর্ত্তন করা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর নেই। আমাদের নিজের বিষয় মুখ-ফুটে অহঙ্কার করা চলে না; কেননা, আমাদের দেহমনের দৈন্য বিশ্বমানবের কাছে প্রত্যক্ষ; সুতরাং আমরা বল্‌তে বাধ্য যে, আমাদের সমাজের সকল ঐশ্বর্য্য অন্তঃপুরের ভিতর চাবি দেওয়া আছে। এ সব কথার উদ্দেশ্য আমাদের নিজের মন যোগানো এবং পরের মন ভোলানো। ও হচ্ছে তোমাদের নামে বেনামী করে আমাদের আত্মপ্রশংসা করা। সুতরাং, যদি মনে কর ওই সব প্রশংসিত গুণে তোমাদের কোন সত্ত্ব জন্মেছে, তাহলে তোমরা যে তিমিরে আছ, সেই তিমিরেই থাক্‌বে।

বীরবল।